পাট শিল্প

সংকট
ও
সমাধানের
উৎস
সন্ধানে

নাগরিক মঞ্চ

একটি সমীক্ষা রিপোর্ট

২০০১

পাট শিল্প ২০০১

সংকট ও সমাধানের উৎস সন্ধানে

পাট শিল্প ২০০১

সংকট ও সমাধানের উৎস সন্ধানে

একটি সমীক্ষা রিপোর্ট

নাগরিক মঞ্চ

'PAAT SHILPA - 2001' *by* Nagarik Mancha

প্রকাশ কাল ঃ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

প্রকাশক ঃ নাগরিক মঞ্চের পক্ষে স্বাতী গুপ্ত
রুম ৭ ব্লক বি (দোতলা)
১৩৪ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫
ফোন ৩৫৩ ১৯২১ ৩৫০ ৮৪১২
ফ্যাক্স ৩৫০ ৪৮৬৪

মুদ্রণ ও অক্ষর বিন্যাস ঃ 'অনিশা'
১৩২এ/১/ডব্লু রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫ ফোন ৩৫৩ ১৩৫২

দাম : ২০ টাকা

সূচীপত্র

ভূমিকা		৪
পাট শিল্প	— মালিকানার সংকট	৬
পাট শিল্প	— বাজারের অবস্থা	৯
পাট শিল্প	— পাট চাষের সমস্যা	১৬
পাট শিল্প	— নানান দেশে	২০
পাট শিল্প	— শ্রমিকদের অবস্থা	২৬
পাট শিল্প	— সরকারি ভূমিকা	৩৪
পাট শিল্প	— মূল সমস্যা ও সমাধানের অভিমুখ	৩৬
পরিশিষ্ট ১	— আগেকার কথা	৪২
২	— পশ্চিমবঙ্গে চটকল	৪৩
৩	— এক নজরে	৪৬
৪	— পাট শিল্পে সমস্যা — সমাধানের দিশা	৪৭

ভূমিকা

দেড়শো বছরের শিল্প একদিকে যেমন পুরনো অন্যদিকে তেমন বৃহৎও—পুঁজি, পরিকাঠামো, বাজার, আয়, শ্রমিক সংখ্যায়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই নানা সময়ে, নানান কারণে, পাট শিল্প স্থান পেয়েছে সংবাদের শিরোনামে। স্বাধীনতার আগে পাট শিল্পের কেন্দ্র ছিল অবিভক্ত বাংলা—পরে তা কেন্দ্রীভূত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু গত দুই দশক ধরে কেউ বলে — এটা 'সূর্যাস্তের শিল্প', আবার কেউ বলে এতেই আছে 'সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা'। শুরু থেকেই নাগরিক মঞ্চের দৃষ্টিতে পাট শিল্পের গুরুত্ব থেকেছে অপরিসীম। কারণটা স্পষ্ট — পাট চাষী, কৃষি মজুর, চটকলের শ্রমিক-কর্মচারি মিলিয়ে ৩০ লাখের বেশী মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে যুক্ত এই একটি শিল্প। ফলে শ্রমজীবী মানুষের সহযোগী হিসেবে ১৯৯০, '৯১, '৯৫ এবং '৯৭ সালে মঞ্চ হাতে নিয়েছিল ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ — এই পাটশিল্পের ওপর। এবারও তেমনি একটা সমীক্ষা চলেছে ১৯৯৯-র শেষাংশ থেকে ২০০০ সালের মে মাস পর্যন্ত। মঞ্চের সীমিত জনবল, অর্থবল, সামর্থ্যের মধ্যে সবচাইতে বেশী সময় ধরে চলা, ১২ টি শিল্পের শ্রমিক বন্ধুদের, শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বের ও কিছু শিল্প পরিচালকদের তথা পেশাদারদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে তৈরি করা হয়েছে এবারের এই প্রতিবেদন। সাহায্য নেওয়া হয়েছে এ বিষয়ের গবেষকদের কাজের ও নানান প্রকাশিত-অপ্রকাশিত তথ্য সংকলনের। আমাদের আগের প্রকাশনার চাইতে এবারেরটা অনেক গঠনমূলক হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রবেশ করা গেছে সমস্যার আরো গভীরে, সন্ধান করার চেষ্টা হয়েছে সমাধানের নানান সম্ভাবনার। পাট শিল্পে চটকল শ্রমিক ও পাট চাষীর দুর্দশা, অধিকার হরণ ও বঞ্চনা; শিল্পের ভবিষ্যৎ; সরকার, মালিক ও শ্রমিকের দায়িত্ব — সব গিয়ে মিলেছে সংকটের মূলের খোঁজে, সমাধানের সম্ভাব্য দিশায়।

এক দশক আগে—১৯৯০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর, যখন নাগরিক মঞ্চের প্রথম বর্ষপূর্তি সভা চলছিল ঠিক তখনই খবর আসে যে শ্রী গৌরীশঙ্কর জুট মিলের শ্রমিক রাজেশ্বর রাই, কারখানার ভিতরেই পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে। সেদিন মিলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকেরা তাদের বহু বছরের বকেয়া পাওনার দাবীতে আন্দোলন করছিলেন। সেই অবস্থানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন সহমর্মী কর্মরত স্থায়ী শ্রমিকরাও। কর্তৃপক্ষ দাবীপত্র গ্রহণ করতে না চাওয়ায় বিক্ষোভ প্রকাশ করে সমেবত শ্রমিকরা। ডাকা হয় পুলিশ — গুলি চলে — শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

এবার দৃশ্য পরিবর্তন — ২০০১ সালের ১৩ জানুয়ারী, বরানগর জুট মিল। বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ডিসেম্বরে কারখানা চালু হয়েছে — হাজার খানেক শ্রমিককে কাজে নেওয়া হলেও বেশীরভাগ শ্রমিককে কাজে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। একদল শ্রমিক খবর দিয়ে ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিল কর্তৃপক্ষের কাছে। খবরে প্রকাশ, শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হওয়ায় কর্তৃপক্ষের একজন ব্যক্তিগত বন্দুক দিয়ে গুলি ছুঁড়লে মৃত্যু হয় শ্রমিক

ভোলা দাসের। কারখানার ভেতরে এমন মৃত্যুতে খুব স্বাভাবিক ভাবেই উত্তেজনা ছড়ায় এবং কর্তৃপক্ষের দুজনের প্রাণ যায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের হাতে।

১৯৯০-ই হোক বা ২০০১—চিরকালই শ্রমিক থেকেছে কোণঠাসা, থেকেছে নায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত। পাশাপাশি প্রায় একই তাল-লয়-ছন্দে চলেছে পাটশিল্পের স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উতোর চাপান, স্লোগান ধর্মী সূর্যাস্ত-সূর্যোদয়ের কবির লড়াই অব্যাহত।

যাঁরা মনে করেন এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নেই তাঁরা বলেন শ্রমিকরা শিল্পের কাছে বিরাট বোঝা; শিল্প অলাভজনক হয়ে গেছে ; বাজার মন্দা; দক্ষ শিল্পপতিদের শিল্প আকর্ষণ করতে পারছে না; মাথা পিছু উৎপাদন কমছে ইত্যাদি। আবার তথ্য-তত্ত্বের ভিত্তিতে যারা সত্যি পাটশিল্পকে চেনেন, বোঝেন তাঁরা বলেন এসব যুক্তি ভিত্তিহীন। তাঁদের মতে এ শিল্প যথেষ্ট লাভজনক; মাথাপিছু উৎপাদন অবিশ্বাস্য রকম বেড়েছে; অতিমাত্রায় মুনাফা লাভের প্রবণতা শিল্পে নৈরাজ্য সৃষ্টির মূলে; আজ অনেক বেশী সংখ্যক মিল চলছে মালিকদের তত্ত্বাবধানে—লীজের সংখ্যা কমছে ; মালিক-শ্রমিক শিল্প বিরোধকে সরকার দেখছে মূলত আইনশৃঙ্খলার দৃষ্টি থেকে তাই সমাধানের রাস্তা দুরস্ত. ইত্যাদি। — এই পটভূমিতেই শিল্প ও শ্রমিকের স্বার্থে আমরা খুঁজতে বেরিয়েছি পাট শিল্পের হাল হকিকৎ।

গৌরীশঙ্কর বা কানোরিয়া বা বরানগরের ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অঘটনের বীজ আছে নৈরাজ্যময় শিল্প পরিচালন-পন্থার গর্ভে। অনেকের মতন আমরাও মনে করি কয়েকটা মাত্র ঘটনা ঘটছে—তার চেয়ে অনেক বেশী ঘটতে ঘটতেও ঘটছে না। অন্যদিকে দার্শনিক-সুলভ নির্লিপ্ততা শুধু শ্রমিকদেরই দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়েছে তাই নয়, এক সম্ভাবনাময় শিল্পের রাশ ছেড়ে দিচ্ছে অদূরদর্শী কিছু অ-শিল্পপতির হাতে। কিছু তথাকথিত হিংসাত্মক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হচ্ছে সারা দেশের মানুষ—চোখের আড়ালে থেকে যাচ্ছে পি এফ, ই এস আই, গ্র্যাচুইটি বাবদ শ্রমিকের বকেয়া প্রায় ছশো কোটি টাকা 'অহিংস' ডাকাতির কথা। চাপা পড়ে থাকছে ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টের এক তথ্য, যা থেকে জানা যায় যে গত দশ বছরে চটকল মালিকরা অন্ততঃ সাতশো কোটি টাকা কর বাবদ ফাঁকি দিয়েছে। এ সব ঘিরে 'হিংসা' নেই, তাই নেই চাঞ্চল্য! পশ্চিমবঙ্গে কয়েক হাজার কোটি টাকা বিক্রয় কর আদায় বাড়ছে আর চটকলগুলি থেকে কর আদায় হচ্ছে বছরে মাত্র ৫০ কোটি টাকা। —এ শিল্প অলাভজনকই বটে!

নাগরিক মঞ্চের কয়েকজন সহযোগীর অক্লান্ত প্রয়াসে এই প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তাঁরা হলেন দেবাশিষ, পার্থ, কাজল ও সুভাষ। প্রতিবেদনটি আমরা পেশ করতে চাই রাজ্য সরকার দ্বারা গঠিত বরানগরকে কেন্দ্র করে পাটশিল্প সম্পর্কিত কমিশনের কাছে। পাশাপাশি শ্রমিক ও শিল্পের স্বার্থে যারা সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করেন তাঁদের এই প্রকাশনা কাজে লাগলে আমাদের এই প্রয়াস স্বার্থক বলে মনে করবো।

১লা ফেব্রুয়ারী ২০০১ নাগরিক মঞ্চ

পাট শিল্প — মালিকানার সংকট

আজকে পাট শিল্পের সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড় সমস্যা মালিকানা ও পরিচালনা সংক্রান্ত। এই সমস্যা বুঝতে গেলে প্রথমেই দেখানো দরকার মালিকানার ও পরিচালনার চরিত্র ও তার বিন্যাস—এর অতীত ও বর্তমান। ১৯৯৬ সালের হিসেব অনুয়ায়ী ভারতবর্ষে জুটমিলের সংখ্যা ৯৩, যার মধ্যে ৫৯ টি পশ্চিমবঙ্গে—যার আবার ৪টি মিল ইংল্যাণ্ডে রেজিস্ট্রীকৃত স্টার্লিং কোম্পানি। পরিকল্পনা ও মালিকানার দিক থেকে এই ৫৯ টি মিলকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) মালিক নিজেই চালায়—৩২টি মিল (২) লীজ বা সাবলীজ নিয়ে চলছে—২১টি মিল (৩) সরকার পরিচালিত — ৬টি মিল।

মালিকানা-ভিত্তিক মিল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতের পাট শিল্পে ব্রিটিশদের বিশেষতঃ স্কটিশদের প্রায় একাধিপত্য ছিল, যদিও এই সব কোম্পানিগুলো তৈরি হয়েছিল মূলতঃ ভারতীয় মুদ্রার বিনিয়োগে। এই মূলধনের অধিকাংশই এসেছিল ভারতে অবস্থানকারী বা ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ব্রিটিশ ব্যবসায়ী, সরকারি ও মিলিটারি অফিসারদের থেকে। পাটশিল্পে তখন যেহেতু প্রচুর লাভ হত, কিছু ভারতীয় মূলধনও বিনিয়োগ হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পাট শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করে। যুদ্ধের সময় ভারতীয়রা চটকলগুলোর মূলধনের একটা বড় অংশ অধিকার করে নেয়। বস্তুতঃ যুদ্ধের আগে থেকেই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের (মূলতঃ মারোয়াড়ী) ফাটকা কারবারের ব্যাপারে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা বিশেষ চিন্তিত ছিল। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত প্রথম দুটি মিল—দি বিড়লা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং এবং হুকুমচাঁদ জুট মিলস্ লিমিটেড। শুধু তাই নয়, ১৯২০ সালে বিড়লা হয়ে পড়ে কাঁচা পাটের প্রথম তিনজন রপ্তানিকারীর একজন। ১৯২৬-২৯ সালের মধ্যেই অনেক পাট ব্যবসায়ী উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ে — যেমন জানকীনাথ রায়, মফতলাল, সুরজমল নগরমল ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখেও মূলধন ও অন্যান্য বিনিয়োগের মালিকানার ৫০ শতাংশ ছিল ব্রিটিশদের হাতে। স্বাধীনতার সাথে সাথে শিল্পের মালিকানার হস্তান্তর ঘটল বহুল পরিমাণে। এর কারণ দুটি (ক) ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর অর্থ এসেছিল যুদ্ধের সময়ে বিভিন্নভাবে মুনাফা ও কালোবাজারী করে। (খ) ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীদের অনিশ্চয়তার চোটে। পাট কেনা-বেচার সাথে যুক্ত বেশ কছু দেশীয় ব্যবসায়ী চটকলের মালিক হয়ে বসল। কিন্তু এই সব দেশীয় শিল্পপতিরা তো আদতে পাটের দালাল বা ফাটকাবাজ। তারা এই শিল্পকে চটজলদি পয়সা কামানোর ক্ষেত্র বানিয়ে তুলল। বন্ধ হতে থাকল একের পর এক চটকল, কমতে থাকল শ্রমিক সংখ্যা। কাঁচা পাট সস্তা দামে কেনা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বেচা পর্যন্ত শুরু হল ফাটকা। চটকলের সংখ্যাও কমতে শুরু করল। একটি পরিসংখ্যান ঃ

সারণি ১	চটশিল্প ও শ্রমিক সংখ্যা	
সাল	চটকল সংখ্যা	শ্রমিক সংখ্যা (লক্ষ)
1911	61	1.99
1921	77	2.81
1931	93	2.68
1941	101	2.86
1951	95	2.79
1961	83	2.38
1971	75	2.43
1981	60	2.43
1991	59	2.42
2001	59	2.02

লীজ বা সাবলীজের মাধ্যমে পরিচালিত মিল

বর্তমানে কারখানা পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই ব্যবস্থা যাতে মালিক ভাড়া দিয়েই খালাস। পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ছে যখন লীজীই (যে লীজ বা ভাড়া নিয়েছে) আবার কারখানা লীজে দিচ্ছে এমন কাউকে যার সম্ভবতঃ কারখানা চালানোর ক্ষেত্রে আইনী স্বীকৃতিই নেই। এই ব্যবস্থায় শিল্পের দীর্ঘকালীন স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য কারণ লীজীদের এই শিল্পে কোনো দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ নেই, ফলতঃ নেই দীর্ঘকালীন প্রকল্প। এদের নজর শুধু চলতি স্বার্থের দিকেই — দ্রুত লাভ এবং লাভে টান পড়লেই চম্পট। এই ব্যবস্থা এতটাই জটিল হয়ে পড়েছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোর্টের পক্ষেও মালিকানা স্থির করাই সমস্যা হয়ে পড়ে। অথচ ক্রমশঃ এই ব্যবস্থা মালিকপ্রিয় হল কেন? — মিল চালাতে অপারগতা, অনীহা, নাকি আশানুরূপ লাভের অভাব, শ্রমিক অসন্তোষ, স্ট্রাইক অথবা এদের ক্রমবর্ধমান বেতন হ্রাস? অথচ এই ব্যবস্থায় শ্রমিকদের বিপদ আরো বেড়ে গেছে। যেহেতু 'মালিকের' দীর্ঘকালীন কোনো দায় নেই, সেহেতু শ্রমিকদের পাওনা বাকি রাখতেও কোনো অসুবিধা নেই।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে লীজীরা আদতে মিলের পাওনাদার (secured creditor) যারা হাইকোর্ট বা সুপ্রীমকোর্ট-এর মাধ্যমে মিল চালাবার অধিকার পায়। এরা এখন কমিটি অফ ম্যানেজমেন্ট তৈরি করে মিলটি চালায়। এই কমিটির ঘন ঘন পরিবর্তন যেমন কারখানাটিকে বিপন্ন করে তোলে, তেমনি বেড়ে চলে শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা। বরানগর জুট মিল এইরকমই একটি মিল, যেটি মাঝে মাঝেই বন্ধ থাকে এইজন্য যে এক হেভিওয়েট পাওনাদার গিয়ে আর একজন আসবে, তারপর আরো একজন ইত্যাদি। যদিও ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে ১৯৫৬ তে 'ম্যানেজিং হাউস' দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা উঠে যাওয়ার আগে সমস্ত চটকলই বড় বড় ইউরোপীয় ম্যানেজিং হাউসরা পরিচালনা করত—যেমন অ্যান্ড্রু ইয়ুল অ্যান্ড কোম্পানি, বার্ড অ্যান্ড কোম্পানি, জার্ডিন স্পিনার অ্যান্ড কোম্পানি ইত্যাদি। এদের আয় নির্ভর করত বিক্রির ওপর, লাভের ওপর নয়। সুতরাং ম্যানেজমেন্টের লক্ষ্য ছিল চটজাত পণ্যের দামের দিকে। এই উদ্দেশ্যে আই জে এম এ (I J M A)-কে তারা ব্যবহার করত উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে—অর্থাৎ এই সংগঠন থেকে ঠিক করা হত সর্বোচ্চ দাম পাওয়ার জন্য শিল্পে কতটা উৎপাদন হওয়া দরকার এবং সেইমত মিলগুলিতে উৎপাদন

করতে বলা হত। যার ভিত্তিতে আবার ঠিক করা হত মিলগুলি সাপ্তাহিক কত ঘন্টা খোলা থাকবে। সুতরাং উৎপাদনে দক্ষতার দিকটি নজরে না রাখলেও চলত। ১৯৩৪-এর এস জি বাজারের রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে পৃথিবীতে পাটের মতো আর কোনও শিল্প নেই যার পরিচালক নিজের ব্যবসা সম্পর্কে এত কম জানে।

সুতরাং বর্তমান লীজ ব্যবস্থা সেই পুরোনো বাতিল হয়ে যাওয়া 'ম্যানেজিং হাউস' পরিচালনার নতুন রূপ কিনা তা ভাবা যেতে পারে।

যদিও উল্লেখযোগ্য যে তথ্যের দিকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল, ১৯৯৫-পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের ৫৯টি জুট মিলের মধ্যে লীজ ব্যবস্থায় পরিচালনায় মিলের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে—বাড়ছে স্থায়ী মালিকানায় থাকা মিলের সংখ্যা।

সরকার পরিচালিত মিল

১৯৮০ সালে লোকসভার একটি আইন বলে ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন (N J M C) নামে একটি পাবলিক সেক্টর ইউনিট তৈরি করা হয় যার অধীনে থাকে ৫টি রুগ্ন চটকল। এই প্রতিষ্ঠানটির অথরাইজড ক্যাপিটাল (authorised capital) ও সাবসক্রাইবড্ ক্যাপিটাল (subscribed capital) হয় যথাক্রমে ৬০ কোটি ও ৫২ কোটি টাকা। গত কয়েক বছরের খতিয়ান নিলে দেখা যাচ্ছে, এদের উৎপাদন ক্রমশঃ কমছে। হিসেবে বলা হয় যে নগদ ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। কাঁচা পাটের অভাব, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অভাব ব্যাহত করছে উৎপাদনকে। বর্তমানে এন জে এম সি-র সব কটি মিলই বি আই এফ আর-এর হাতে। এর অপারেটিং এজেন্সি আই আই বি আই। এন জে এম সি-র মিলগুলি মোটামুটিভাবে সার্বিক শিল্পচুক্তি মেনে চলার চেষ্টা করে। যেমন শেষ বেতনচুক্তি মেনে চলা, '৯৫-৯৬ অবধি বকেয়া বোনাস দিয়ে দেওয়া, ইত্যাদি। এখনও অবধি ২,২৯৬ জন শ্রমিককে ১২.৩ কোটি টাকা গ্র্যাচুইটি বাবদ দিতে পেরেছে, যদিও ১৯৮৫ জন এখনও গ্র্যাচুউটি পাননি। মার্চ ১৯৯৫ থেকে পি এফ এবং ই এস আই বাবদ যথাক্রমে ২১.৩৩ কোটি, এবং ৫.১১ কোটি টাকা দিয়েছে, এবং বাকি আছে এখনো যথাক্রমে ২৪.৭৭ কোটি এবং ১.১৭ কোটি টাকা। বর্তমানে এই মিলগুলির মোট শ্রমিক সংখ্যা — স্থায়ী ১৬,০৬৭ এবং স্পেশাল বদলি ৪,৮৬৭। সরকার পরিচালিত মিলগুলির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল স্থায়ী শ্রমিক ও স্পেশাল বদলি শ্রমিকদের অনুপাত— যা সাধারণভাবে ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পে থাকা স্থায়ী শ্রমিক ও স্পেশাল বদলি শ্রমিকের অনুপাতের বিপরীত। ■

পাট শিল্প — বাজারের অবস্থা

এবার আসা যাক কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাজার প্রসঙ্গে। পাট শিল্প তার জন্মলগ্ন থেকেই নির্ভরশীল ছিল বিদেশী বাজারের ওপর। অর্থাৎ এটি ছিল রপ্তানি-নির্ভর শিল্প। এর অর্থ এই যে ইউরোপীয় বাজার হ্রাস পেলেই কাঁচা পাটের ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদার দ্রুত পতন ঘটত। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রাথমিকভাবে পাট শিল্পে মন্দা নিয়ে এলেও পরের দিকে বালির বস্তা, ক্যানভ্যাস, শস্যের বস্তা ইত্যাদির চাহিদা এত বেড়ে যায় যে কলকাতার চটকলগুলি প্রচুর মুনাফা করে। আবার তিরিশের বিশ্বব্যাপী মন্দার সাথে সাথে কলকাতার চটকলগুলোর মুনাফায় টান পড়ে, যদিও শেষ তিরিশে মন্দা কেটে যাওয়ার সাথে সাথে তারা এই সংকট কাটিয়ে ওঠে। নীচের সারণি থেকে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির উত্থান-পতন বোঝা যাবে।

সারণি ২ | **কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি**

সাল	কাঁচা পাটের রপ্তানি		রপ্তানি করা পাটজাত দ্রব্যের মোট মূল্য (হাজার টাকা)
	পরিমাণ (টন)	মূল্য (টাকা)	
1919-20	592	246915	50055
1922-23	578	225285	404942
1924-25	696	290930	517666
1927-28	892	306626	535643
1930-31	620	128847	318945
1932-33	563	97303	217118
1935-36	771	137076	234895
1938-39	690	133967	262611

তথ্যসূত্র ঃ অমিয় বাগচী — 'ভারতের আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন ১৯০০-১৯৩৯,' পৃঃ ৩০৩।

এর পর এল স্বাধীনতা ও দেশ ভাগ। ঘটে গেল কাঁচা পাট উৎপাদনের স্থান ও চটকলের মধ্যে একটা দেশের পার্থক্য। নদী-মাতৃক পূর্ববঙ্গে হত উচ্চ মানের পাট চাষ আর হুগলি নদীর দুপার বরাবর পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ছিল চটকল। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করল একের পর এক চটকল। কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠল পূর্ব পাকিস্থান। ১৯৪৯-৫০ এ ভারতের মোট রপ্তানির ২৭.৫% ছিল চটজাত সামগ্রী— যেখানে বস্ত্রশিল্প ১৫.৭% এবং চা ১৫.৬%। ভারতের মোট ডলার উপার্জনের ৬০% আসত চটশিল্প থেকে। ক্রেতা ছিল আমেরিকা, আর্জেন্টিনা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু এই রপ্তানি চলতে চলতে আশির দশকে, তলানিতে এসে ঠেকে — ২.৯%। রপ্তানির পরিমাণের দিক থেকে বিচার করলে ১৯৪৮-এ ৯৪৭,০০০ টন, ১৯৭৯-৮০-তে ৪৯২,০০০ টন থেকে ১৯৯৭-৯৮-তে ১২২,০০০ টন-এ নেমে এসেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে চটজাত দ্রব্যের রপ্তানিতে ১৯৬৫ সালে ভারতের ভাগ ছিল ৯০%, সেই ভাগ '৯০-এর মাঝামাঝি ২২%-এ এসে ঠেকেছে। স্যাকিং-এর ক্ষেত্রে ভারত পঞ্চাশের দশক থেকেই বাইরের বাজার হারাচ্ছে। ১৯৫১-এ যেখানে স্যাকিং-এর রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৪০.৬ লক্ষ টন, ১৯৬৭ তা ১৮০.৮ লক্ষ টনে এসে ঠেকেছে। ১৯৯৬-৯৭ তে এর পরিমাণ ২.৫ লক্ষ টনে নেমে গিয়েছে। '৬০ এর মাঝামাঝি থেকেই ইউ কে, পশ্চিম ইউরোপ, কানাডা, আর্জেন্টিনা এবং আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে হেসিয়ানেরও বাজার পড়তে শুরু করল। যেমন ইউ কে ১৯৬৬-৬৭-তে আমদানি করে ২১.৯ লক্ষ টন হেসিয়ান, অথচ ১৯৬৩-৬৪-তে এর পরিমাণ ছিল ৩১.৭ লক্ষ টন। পশ্চিম ইউরোপে ঐ একই সময়ে হেসিয়ানের আমদানি নেমে আসে ২৭.১ লক্ষ টন থেকে ৮.২ লক্ষ টনে। সত্তরের দশকে বাৎসরিক ৩.৫% চক্রবৃদ্ধি হারে রপ্তানি কমেছে। কারণ গোটা সত্তর দশক জুড়ে কার্পেট ব্যাকিং ও স্যাকিং-এর বাজার হারিয়েছে। '৮০-র দশকে ভরসা ছিল সোভিয়েত রাশিয়াসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর চাহিদা। '৯০-এর দশকে সোভিয়েতের পতন রপ্তানি বিশ্বে ভারতকে কোণঠাসা করে ফেলেছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা দুটি সারণি সংযোজন করছি। প্রথমটিতে (সারণি ৩) আমরা ১৯৪৯ সাল থেকে '৯৬-৯৭ অবধি পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ কী ভাবে কমছে তা দেখাবার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয়টিতে (সারণি ২) আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি ভারতবর্ষের সমগ্র রপ্তানিতে পাটজাত দ্রব্যের গুরুত্ব কীভাবে কমেছে।

সারণি-৩ | পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি (হাজার টন)

এপ্রিল-মার্চ	হেসিয়ান	স্যাকিং	কার্পেট ব্যাকিং	অন্যান্য	সামগ্রিক
1949-50	399.5	375.9	–	36.0	811.8
1954-55	375.5	447.8	–	41.3	864.6
1958-59	432.3	324.2	–	40.4	796.9
1962-63	519.1	282.2	–	72.7	874.0
1966-67	360.1	180.8	134.2	60.5	735.6
1970-71	268.2	85.7	152.9	51.0	557.8
1974-75	265.6	130.1	119.6	69.9	585.2
1978-79	184.2	8.3	90.8	44.8	328.1
1982-83	214.1	36.0	51.4	28.1	329.6
1986-87	179.1	24.5	48.8	24.3	276.7
1990-91	149.4	17.8	15.1	23.2	205.5
1994-95	117.6	5.0	27.3	71.5	221.4
1996-97	86.7	2.5	14.4	52.6	156.2

তথ্যসূত্র ঃ Annual Summary of Jute & Gunny Statistics, 1997-98, IJMA.

সারণি-৪	ভারতবর্ষের বর্হিবাণিজ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অংশভাগ										(শতাংশ)
শিল্প	1958	1962	1966	1970	1974	1978	1982	1986	1990	1994	1998
পাটজাত দ্রব্য	18.23	22.77	22.08	12.59	9.47	2.95	2.42	2.46	0.95	0,59	0.56
চা	23.93	18.64	13.67	9.75	6.86	5.96	4.21	4.65	3.29	1.18	1.19
বস্ত্র	13.81	11.13	8.77	9.17	7.74	4.63	2.81	2.90	1.07	1.97	2.45
চর্মশিল্প	4.83	5.35	6.54	5.05	4.37	5.75	4.10	5.89	0.94	6.11	3.78
তেল তৈলবীজ	3.20	6.94	0.68	0.82	1.92	0.52	0.82	0.52	9.95	2.71	3.15
চিনি	–	–	–	–	10.23	2.38	0.76	0.01	0.10	0.08	0.19
ইঞ্জিনিয়ারিং	–	–	–	–	10.74	12.56	8.79	6.94	10.35	–	–
ধাতু	–	–	–	–	13.38	14.24	7.82	6.89	4.06	2.62	2.10
ইলেকট্রনিক্স	–	–	–	–	–	–	–	–	1.28	1.57	2.06
কমপিউটার	–	–	–	–	–	–	–	–	0.05	–	–
ধাতব সামগ্রী	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.68	3.16
সামুদ্রিক	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.28	3.42
রত্ন ও গহনা	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.09	15.05
পেট্রোলিয়াম	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.58	1.04

তথ্যসূত্র ঃ Annual Summary of Jute & Gunny Statistics, 1997-98, IJMA

আন্তর্জাতিক বাজারে পতন সত্ত্বেও চটশিল্প টিঁকে গেল আভ্যন্তরীণ বাজারকে কেন্দ্র করে। যদিও এই আভ্যন্তরীণ বাজারের বৃদ্ধিতে সরকারের দাক্ষিণ্য অনেকটাই। ১৯৪৯-৫০-এ পাটজাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ বাজার ছিল ১০% । '৯০-এর দশকে এই পরিমাণ পৌঁছয় ৮৬.২৭%। পরিমাণের দিক থেকে ১৯৪৮-এ আভ্যন্তরীণ চাহিদা ছিল ১৩১,০০০ টন, ১৯৯৭-৯৮ তে এর পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১৩৮৭,০০০ টন। এর কারণ হিসেবে বলা যায় দেশের শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রের প্রসারণ ও প্যাকেজিং আইটেম হিসেবে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি। আভ্যন্তরীণ বাজারের সবচেয়ে বড় ক্রেতা সরকার। এফ সি আই কেনে বিটুইল ব্যাগ, পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ কেনে জুট টোয়াইন ও অন্যান্য ব্যাগ। একসময়ে ফার্টিলাইজার ও সিমেন্ট শিল্প অনেক জুট ব্যাগ কিনত কিন্তু এখন তার পরিমাণ দ্রুত কমছে। অভিযোগ, জুটব্যাগ জল বা জলীয় বাষ্প প্রতিরোধক হিসেবে বিশেষ কার্যকরী নয়।

নীচের তথ্যপঞ্জী একই সঙ্গে দেখিয়ে দেয় ভারতবর্ষ কীভাবে একদিকে রপ্তানির বাজার হারাচ্ছে এবং অন্যদিকে ক্রমপ্রসারণশীল আভ্যন্তরীণ বাজার কীভাবে টিকিয়ে রেখেছে শিল্পটিকে ও তার ভবিষ্যৎকে।

সারণি-৫	মিলগুলি কত পরিমাণ পাটজাত দ্রব্য বাজারে পাঠায় (despatch)			(হাজার টন)
সাল (জানু-ডিসে)	রপ্তানি	আভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যের পরিমাণ	বাজারে মোট পাঠানো	শতাংশে আভ্যন্তরীণ বাজার
1951	751.9	123.1	875.0	14.06
1955	862.7	171.9	1034.6	16.62
1959	878.3	235.7	1114.0	21.16
1963	866.9	333.0	1199.9	27.75
1967	757.0	388.3	1145.3	33.90
1971	607.1	433.4	1184.5	40.30
1979	--	821.6	1335.9	61.50
1983	301.9	1062.8	1364.7	77.88
1987	247.5	1007.1	1254.6	80.27
1991	228.2	1207.6	1435.8	84.11
1995	249.7	1191.5	1441.2	82.67
1997	303.0	1314.6	1617.6	81.27

তথ্যসূত্র ঃ Annual Summary of Jute & Gunny Statistics, 1997-98, IJMA

প্রসঙ্গত আরো একটি দিক উল্লেখ করা যেতে পারে। যখনই উচ্চ মানের কাঁচা পাটের প্রয়োজন তখনই মিল মালিকরা সহজ পন্থা হিসেবে বাংলাদেশ থেকে তা আমদানি করে নেয়। এই আমদানি বর্তমানে বাড়তির দিকে। ১৯৯৭-৯৮ সালে আমদানি করা কাঁচা পাটের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ বেল, যা ১৯৯৮-৯৯-তে ৯ লক্ষ বেলে পৌঁছেছে।

রপ্তানি বাণিজ্যে ভারত এরকমভাবে পিছিয়ে পড়ল কেন? অনেক ভাবনা, অনেক মত। এরই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো সাজানোর চেষ্টা করা যাক।

একটি মতে, পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) রপ্তানি ভর্তুকি অনেক কার্যকরীভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে। সুতরাং দামের দিক থেকে ভারত প্রতিযোগিতায় ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ে। একজন বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদের মতে ভারতীয় পাটশিল্প বাংলাদেশের পাটশিল্পের থেকে বেতন ও কাঁচা পাটের দাম বাবদ বেশী দেয় যথাক্রমে ৫০% এবং ২৫%।

পাটের বিকল্পের সন্ধান চলছে বিশের দশক থেকেই। বিদেশে কৃষিক্ষেত্রে বস্তার পরিবর্ত হিসেবে ধাতব আধারের ব্যবহার বহুদিন থেকেই। তার সঙ্গে এল কাগজ। চাল, ডাল ইত্যাদির খুচরো বিক্রির জন্য এল ছোট ছোট প্যাকেট। উন্নয়নশীল দেশ যেমন নেপাল, বর্মা, ইরাক, সুদান, মিশর, ব্রাজিল ও চীন সত্তরের দশক থেকেই স্থায়ীভাবে দেশজ অথবা আমদানি করা তন্তু দিয়ে বস্তা তৈরিকে উৎসাহ দিচ্ছে। ৮০'এর দশকে জাপানে চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের প্যাকিং-এর জন্য কাগজ ও পলিথিনের ব্যাগের ব্যবহার শুরু হয়।

বিকল্পের সন্ধানে ৬০'এর দশকে এসে গেল সিনথেটিক্স (প্লাসটিক বা পলিমার)। আন্তর্জাতিকভাবেই পাট শিল্পে নেমে এল গভীর সঙ্কট। বাজারে পাটের মূল গুরুত্ব প্যাকেজিং-এ। সিনথেটিক এসে এখানেই থাবা বসাল। এমনকি শিল্প ব্যবহারে ও কার্পেট ব্যাকিং-এ বহুল ব্যবহার হতে থাকল সিনথেটিক দ্রব্য। কিন্তু কী কারণে জনপ্রিয় হয়ে উঠল এই

সিনথেটিক্স ?

(১) চটের মতো যোগানের অনিশ্চয়তা নেই।

(২) তুলনামূলকভাবে দাম অনেক কম।

সিনথেটিক দ্রব্য ছোট ছোট শিল্পে তৈরি হয়। এগুলি উৎপাদন শুল্ক মুক্ত। উপরন্তু এই সব শিল্প সংস্থায় শ্রমিকদের বেতনের কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো নেই। নেই আইনী বাধা নিষেধ। তাই শ্রমিকদের বেতন বাবদ ব্যয় অনেক কম।

সারণি-৬ চট ও সিনথেটিকের দামের তুলনা

Estimated Average Price and Price Ratios of Jute and Competing Synthetic Products in the USA (cents per yard and percentages)

	P_1	J_1	P_1 as percent of J_1	P_2	J_2	P_2 as percent of J_2	P_3	J_3	P_3 as per cent of J_3
1967	10.20	14.20	71.8	76.00	82.00	92.7	–	–	–
1968	9.80	13.80	71.0	72.00	80.00	90.0	–	–	–
1969	10.70	15.10	70.0	72.00	89.00	80.9	–	–	–
1970	10.90	15.50	70.3	68.00	75.00	90.7	–	–	–
1971	12.50	18.10	69.0	66.00	76.00	86.8	–	–	–
1972	13.70	20.60	66.5	72.00	93.00	77.4	–	–	–
1973	13.20	19.40	68.0	72.00	83.00	86.7	75.00	68.00	110.2
1974	14.40	26.70	53.0	72.00	95.00	75.8	79.00	75.00	105.3
1975	14.80	20.30	72.9	72.00	87.00	82.8	66.00	67.00	98.5
1976	15.30	17.40	87.9	77.00	69.00	111.6	66.00	55.00	120.0
1977	17.50	20.10	87.1	76.00	73.00	104.0	66.00	58.00	113.8
1978	18.20	19.70	92.4	79.00	82.00	96.3	67.00	64.00	104.7
1979	19.80	27.10	73.1	81.00	108.00	75.0	76.00	95.00	80.0
1980	21.40	36.40	58.8	88.00	127.00	69.3	83.00	92.00	90.2
1981	22.50	25.10	89.6	90.00	102.00	88.2	84.00	74.00	113.5
1982	22.80	24.20	94.2	79.00	89.00	88.8	76.00	64.00	118.8
1983	22.80	26.10	87.7	80.00	95.00	84.2	71.00	67.00	106.0
1984	23.00	29.70	77.4	92.00	130.00	70.8	78.00	78.00	100.0

Symbols : P^1 - price of polypropylene cloth (10 oz., 40")
J^1 - price of hessian cloth (10 oz, 40")
P^2 - price of polypropylene primary carpet backing.
J^2 - price of jute primary carpet backing.
P^3 - price of polypropylene secondary carpet backing.
J^3 - price of jute secondary carpet backing.

Source : Burger, et, al, (1985) p., 116.

Price category/Period	Instability index
P^1 (1964-84)	81.0
J^1 (1964-84)	104.6
P^2 (1968-84)	33.8
J^2 (1968-84)	67.0
P^3 (1973-84)	24.4
J^3 (1973-84)	56.0

(৩) সিনথেটিকের জলীয় বাষ্প নিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশী। তাই সিমেন্ট শিল্পে সিনথেটিকের চাহিদা বাড়তে থাকল। ১৯৯৩-৯৪-এ যেখানে সিমেন্ট শিল্পে পাটজাত পণ্যের চাহিদা ছিল ৯০০০ মেট্রিক টন সেখানে ১৯৯৭-৯৮-তে এই চাহিদা নেমে দাঁড়িয়েছে ০.১০০ মেট্রিক টন।

(৪) সিনথেটিক দ্রব্য হালকা। একই মালের সিনথেটিক প্যাকের ওজন ৪ পাউণ্ড, যেখানে চট বস্তার ওজন ১১.৫ পাউণ্ড। ফলে পণ্য পরিবহন খরচ সিনথেটিকের অনেক কম।

(৫) সিনথেটিক দ্রব্যের কাঁচা মাল অর্থাৎ রেসিনের দাম শুধু কম নয়, মোটামুটি স্থিতিশীল। এক বর্গ গজ প্রাইমারি কার্পেট ব্যাকিং-এর উৎপাদন খরচের ৩০% পলিপ্রপিলিন রেসিনের দাম। বস্তার ক্ষেত্রে এই খরচ ২৫%। এবং মজার ব্যাপার এই যে ক্রুড অয়েলের দাম শতকরা একশভাগ বাড়লেও রেসিনের দাম বাড়ে ১৫ থেকে ১৮ শতাংশ এবং মূল উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি হয় মাত্র ৫ শতাংশ। যেখানে কাঁচা পাটের খরচ মোট উৎপাদন খরচের প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ। এই সব কারণে প্রাইমারি কার্পেট ব্যাকিং-এর বাজার ভারত বহু আগেই হারিয়েছে (৬০-এর দশকের শেষে)। সেকেন্ডারি কার্পেট ব্যাকিং-এর ক্ষেত্রে কিছু বাজার এখনও আছে। পঞ্চাশ ইঞ্চির হেসিয়ানের সমস্ত মার্কেটই সিনথেটিকের কব্জায়। পঞ্চাশ ইঞ্চির বেশী হেসিয়ানের (যার ব্যবহার শিল্পে ও অটোমোবাইলে) এখনও কিছু পরিমাণ বাজার রয়ে গেছে। সিনথেটিক উলপ্যাক জাপান ও অস্ট্রেলিয়ায় ভাল বাজার করে নেয় '৭০-এর দশকে, কারণ জুটপ্যাক ওজনে ভারী এবং দামেও বেশী।

রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের পিছিয়ে পড়ার আর একটি বড় কারণ সম্ভবতঃ এই শিল্প, মানসিকতার দিক থেকে পড়ে আছে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন উৎপন্ন দ্রব্যগুলো বেশীরভাগই ছিল মোটা উপাদানে তৈরি এবং ব্যবহৃত হত মূলতঃ শস্য, পশম ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য পরিবহণে। দ্রব্যগুলি ছিল অসম্ভব সস্তা, ভাল জাতের কাঁচা পাট পাওয়া যেত কাছেই, আর ছিল সস্তা শ্রমিক। তারপর বয়ে গেছে অনেক সময়। চাহিদার রকমফের হয়েছে, দেশভাগ হয়েছে, শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠন হয়েছে, সরকারের মানসিকতারও বদল হয়েছে — কিন্তু বদল হয়নি জুটমিলগুলির। ফলে বেড়ে গেছে উৎপাদন খরচ, হারাচ্ছে বাজার। এই সব মিলগুলির দুই-তৃতীয়াংশ যন্ত্রপাতি ৭৫ বছরের পুরনো এবং সেগুলির পরিবর্তন আশু প্রয়োজন। পাঁচ দশকের মাঝামাঝি থেকে নতুন ও আধুনিক যন্ত্র নিয়ে আসার একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল। রোভ স্পিনিং সিস্টেমের জায়গায় এসেছিল স্লিভার স্পিনিং সিস্টেম। কিন্তু উইভিং এবং ফিনিশিং ডিপার্টমেন্ট রয়ে যায় প্রায় সেই মান্ধাতার আমলে। কিন্তু '৬০এর মাঝামাঝি এসে স্পিনিং ডিপার্টমেন্টের আধুনিকতাও কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। একটা হিসেবে থেকে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। ১৯৫৮ থেকে, ১৯৬২ বাদ দিয়ে (যখন নতুন স্পিনিং ফ্রেম ও ব্রডলুম আসে), এই শিল্পে কোনো বছরে শিল্পোৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের আধুনিকতার জন্য (সামগ্রিকভাবে) ৫ কোটি টাকার বেশী খরচ হয়নি—তাও একসাথে নয়। ১৯৭৬-এ আই ডি বি আই আধুনিকতার জন্য 'সফ্‌ট লোন' প্রকল্প চালু করে। কিন্তু মিল মালিকেরা তাতে বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। মাত্র ৬ কোটির মতো ঋণ শিল্প পরিচালকরা নিয়েছিলেন।

মধ্য ষাটের পর শিল্পের সামগ্রিক অবনমনের সাথে সাথে পশ্চিমী দেশগুলো এবং জাপান মোটামুটি চটপ্রযুক্তির গবেষণা ছেড়েই দিয়েছে। সুতরাং ভারতীয় গবেষণা সংস্থাগুলোর সামনে এসে গেছে একটা বড় দায়িত্ব—ভারতীয় পাটকলগুলোর জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি তৈরি করা। মিল মালিকরা আগ্রহী হলে তা সম্ভব হবে কিনা তা দেখার ব্যাপার। যদিও সেই সময়ে সরকার সেকেণ্ড হ্যাণ্ড যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আমদানির ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছিল। আধুনিক লুম (অটোমেটিক সাটললেস হাই-স্পিড লুম এবং মুলজার লুম) যেমন পশ্চিম ইউরোপ থেকে আমদানি করতে হবে, তেমনি উৎসাহ দিতে হবে দেশীয় উৎপাদনকেও। ১৯৮৬ এর নভেম্বরে নতুন জুট মডার্নাইজেশন ফাণ্ডে ১৫০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। সরকার চায় যে এই টাকা উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি, নতুন প্রযুক্তি, প্রোডাক্ট-মিক্স, রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদিতে খরচ হোক। বর্তমান প্রযুক্তির সম্বরণ (supplementation) ও সারানোর (renovation) ওপর জোর দেওয়া চলবে না। সেকেন্ড হ্যান্ড মেশিন

কিনতে দেওয়া হবে না। যদিও এই স্কীম অনেক দিক থেকেই আশঙ্কাজনক, কিন্তু মিল মালিকরা তাদের অনাগ্রহ অব্যাহত রেখেছে। ১৪টি মিলের জন্য ৫৭.২৯ কোটি টাকা মঞ্জুর হলেও ব্যয়িত হয়েছে মাত্র ৮.৭ কোটি টাকা।

এই ঘটনা শুধু দুঃখেরই নয়, বোধহয় পাটশিল্পের এক ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে। ১৯৩৪ সালে ডঃ এস জি বার্জারকে ভারতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল পাটশিল্পে পণ্য প্রস্তুতিকরণের বিষয়গুলি সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরির জন্য, তিনি দেখেছিলেন উনবিংশ শতাব্দির শেষ থেকে মূল প্রস্তুত প্রণালীর পরিবর্তন হয়েছে খুব সামান্যই। বহু যন্ত্র ছিল অত্যন্ত প্রাচীন। পরিদর্শক ও কারিগরী কর্মীদের বৈজ্ঞানিক ধারণার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। 'কি আশ্চর্য্য! ছয় দশকের বেশী সময় পরেও অবস্থাটা কিন্তু বিশেষ বদলায়নি।

আরো একটি ব্যাপার আলোচনায় আনা যেতে পারে। শিল্পে আধুনিকতা মানে পুরনো সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির পরিবর্তনই শুধু নয়, নতুন পণ্য ভাবনা ও উৎপাদনও এর অভিন্ন অংশ। পাটকে নতুন নতুন প্রতিযোগীর সামনে নিজেকে বদলে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। সিনথেটিকের প্রতিযোগিতাকে মোকাবিলার জন্য তাকে হয়ে উঠতে হবে হালকা, কমাতে হবে কাঁচা পাটের ব্যবহার (মূল বুননে বৈশিষ্ট্যগুলোকে অক্ষুণ্ণ রেখে), অন্যান্য তন্তুর সাথে মিশিয়ে ব্লেন্ডেড ফেব্রিক্স-এর বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির দিকে ঝুঁকতে হবে, জোর দিতে হবে গুণগত মান (quality control) বজায় রাখার দিকে। নতুবা বাজারে টেঁকা অসম্ভব। এই সংক্রান্ত গবেষণার জন্য সরকার নির্ভর করে ইন্ডিয়ান জুট ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের (আই জে আই আর এ) ওপর—যদিও এই সংস্থা প্রাথমিকভাবে প্রাইভেট মিল মালিকরাই প্রতিষ্ঠা করেছিল—পরবর্তীকালে তা সরকার নিয়ে নেয়। বর্তমানে প্রাইভেট মিল মালিকরা এই সংস্থার পেছনে কিছুই ব্যয় করে না। এমনকি সরকারও এই সংস্থায় বিশেষ খরচ করে না—অথচ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পেট্রোকেমিকেল শিল্প গবেষণায় দেশের অনেক শিল্প সংস্থা বহু অর্থ ব্যয় করে (পাট শিল্পে সামগ্রিক উৎপাদন খরচের ১ শতাংশের অর্ধেকও খরচ হয় না)। সিনথেটিকের রমরমার এটিও একটি বড় কারণ। এই সংস্থার দাবি অনুযায়ী অনেক নতুন ধরণের চট জাত সামগ্রী তারা গবেষণাগারে তৈরি করতে পেরেছে, যেমন ওয়াল কভার, ডেকরেটিভ ফেব্রিক্স, ফিলটার ফেব্রিক্স, কম্বল, কার্পেট, ডিসপোসেবল ইনসুলেটিং মেটিরিয়াল, মাটি শক্ত করার জন্য জিওটেক্সটাইল ইত্যাদি। কিন্তু এগুলিকে বাস্তবে উৎপাদন করিয়ে কীভাবে বাজারের উপযোগী (viable) করতে পারা যাবে সে সম্পর্কে কিছুই জানা যাচ্ছে না। অথচ গবেষকরা দক্ষ এবং আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগারও তাদের হাতে আছে বলে বিভিন্ন সূত্রে এ তথ্য আমরা পেয়েছি। ■

পাট শিল্প — পাট চাষের সমস্যা

এতক্ষণ আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল মূলতঃ চটকলের মালিকানা ও পাটজাত দ্রব্যের বাজারের মধ্যে। এবার আসা যাক কাঁচা পাট প্রসঙ্গে। আসলে মাঠ থেকে কারখানা হয়ে বাজারে গিয়েই শেষ হয় পাটের পরিক্রমা। তাই মাঠকে বাদ দিয়ে পাটের কোনো আলোচনাই হতে পারে না।

ভাল মানের পাটজাত পণ্যের জন্য প্রয়োজন ভাল মানের পাট যা আবার নির্ভরশীল ভাল জাতের বীজ, উন্নত চাষ পদ্ধতি (line rowing system), সার, সঠিক বর্ষা, সর্বোপরি রেটিং-এর ওপর। গত শতাব্দী থেকেই ভারতীয় চটকলে ব্যবহৃত পাটের প্রায় সবই আসত অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও পদ্মার ব-দ্বীপ অঞ্চল থেকে। স্বাধীনতা ও দেশভাগের সময়ে দেশের ৭৫ শতাংশ পাট চাষের জমি ছিল পূর্ববঙ্গে এবং ৮০ শতাংশ কাঁচাপাটই আসত। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে দেশভাগ পাট শিল্পে সামগ্রিক ভাবে অভিশাপ নিয়ে এল। চটকলগুলো রয়ে গেল ভারতে আর পাট চাষের জমি চলে গেল আর এক রাষ্ট্রে। ১৯৪৭ সালে যেখানে চটকলের সংখ্যা ছিল ১১১, ১৯৪৮-এ তা নেমে আসে ১০৬-এ। স্বাধীনতার পরে ভীষণভাবে পড়ে গেল কাঁচা পাটের উৎপাদন। ১৯৪৫-৪৬ এর ৮.০৫ মিলিয়ন বেল এবং ১৯৪৬-৪৭ এর ৫.৬৯ মিলিয়ন থেকে ১৯৪৭-৪৮ এ এই উৎপাদন নেমে আসে ১.৬৭ মিলিয়ন বেলে। সুতরাং স্বাধীনতার পর ভারত সরকারের প্রথম চেষ্টা হল কাঁচা পাট উৎপাদনে ভারতবর্ষকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার। আউশ ধানের জমিতে পাট চাষ করতে উৎসাহ দেওয়া হতে থাকল। ১৯৪৭ থেকে '৫৬-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পাট চাষের জমি বেড়ে গেল তিনগুণ, আসাম ও বিহারে দুগুণ। এখন পৃথিবীতে মোট পাটচাষের ৪০ শতাংশই হয় ভারতবর্ষে। বছরে গড়ে ৮০ লক্ষ বেল কাঁচা পাট উৎপাদিত হয়। পশ্চিমবঙ্গেই পাট চাষ হয় ৬.৫৪৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে। পশ্চিমবঙ্গের ২০ লক্ষ পরিবারের ৩০ লক্ষ সদস্য এই চাষের সঙ্গে যুক্ত।

এই বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পাট চাষ যদি সারা বৎসর করা যায় তাহলে ফাটকা-জাত সমস্যা কমানো যায়। এর জন্য দরকার কম জলে পাটচাষ ও রেটিং-এর ব্যবস্থা করা। আবার তার জন্য দরকার শুকনো সময়ে যাতে পাট চাষ করা যায় তার উপযুক্ত বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করা। তেমনি রেটিং-এর ক্ষেত্রে দরকার মাইক্রোবায়োলজিকাল ট্রিটমেন্ট ও য়ান্ত্রিক রেটিং-এর ব্যবস্থা যা জলের (বৃষ্টির) ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনবে এবং ফলত পাটচাষকে মরসুমী চাষের আওতার বাইরে নিয়ে আসা যাবে। তেমনি যদি কমিয়ে নিয়ে আসা যায় পাট বীজ বপন থেকে পাটের আঁশ ছাড়ানোর সময়ের ফাঁক, তাহলে পাট চাষ সারা বৎসরে একবারের বেশী যেমন করা সম্ভব হবে তেমনি কমবে পাট চাষে নিয়োজিত চাষীর মূলধন একটি চাষে দীর্ঘদিন আটকে থাকার সমস্যা। এতে ফাটকার কারণে পাটচাষীদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কমবে।

সারণি ৭	কাঁচাপাট উৎপাদন (ভারতবর্ষে)
সাল	লক্ষ বেল
1993-94	73.83
1994-95	79.97
1995-96	77.43
1996-97	97.51

পাট চাষে ভারতবর্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও কিন্তু কিছু সমস্যা রয়ে গেল। যেমন ভারতবর্ষের কাঁচা পাটের জাত খুব উন্নত নয়। 1981-র জে এম ডি সি-র টেকনিকাল কমিটি-র রিপোর্ট অনুযায়ী সাদা পাট ও তোষা পাটের অনুপাত ৩০:৭০। এর মধ্যে ডবলু/৫ এবং টিডি/৫ মাপের পাটই ৩৬ শতাংশ, ৪ নং গ্রেডের পাট হয় ৪০ শতাংশ ও গ্রেড ১ এবং ২ মিলিয়ে সমগ্র পাট উৎপাদনের মাত্র ৩ শতাংশ। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য শস্য ও ফসলের সঙ্গে তুলনা করলে পাট চাষের বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক নয়।

পাট — ১.২
ধান — ১.৩
গম — ২.৫
ডাল — ১.৩
তুলো — ২.৮ [সূত্র ঃ ***Goutam Sarkar : Jute In India***]

আই জে এম এ প্রকাশিত Annual Summary of Jute and Gunny Statistics (1997-98)-এ প্রদত্ত একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে ৫০-এর দশক থেকে ৮০'র দশকের প্রথম পর্যন্ত হেক্টর প্রতি ফলন ৬ বেল থেকে ৭.৫০ বেলের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, এবং এই তথ্যের থেকে মনে হয় যে এই চাষ প্রকৃতির ওপর বড়ই নির্ভরশীল। ১৯৮১-৮২ থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির হার একটু স্থিতিশীলতা অর্জন করছে। পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ ঃ—

সারণি-৮	পাট চাষে জমি, উৎপাদন ও ফলন						
সাল	পাট চাষে জমি	উৎপাদিত ফসল	হেক্টর প্রতি ফলন	সাল	পাট চাষে জমি	উৎপাদিত ফসল	হেক্টর প্রতি ফলন
1953-54	4.97	31.15	6.26	1968-69	5.29	29.32	5.56
"54-55	5.03	29.50	5.86	"69-70	7.67	56.55	7.36
"55-56	7.04	42.30	6.00	"70-71	7.49	49.38	6.5
"56-57	7.72	43.20	5.59	"71-72	8.15	56.84	6.97
"57-58	7.05	40.14	5.69	"72-73	7.00	49.78	7.11
"58-59	7.33	51.98	7.09	"73-74	7.92	62.20	7.85
"59-60	8.82	45.34	6.64	"74-75	6.64	44.10	6.73
"60-61	6.12	40.13	6.55	"75-76	5.85	44.40	7.59
"61-62	9.23	63.96	6.92	"76-77	7.37	53.53	7.26
"62-63	8.51	54.48	6.40	"77-78	7.97	53.61	6.73
"63-64	8.68	61.84	7.12	"78-79	8.84	64.70	7.32
"64-65	8.38	60.20	7.18	"79-80	8.34	60.72	7.28
"65-66	7.53	44.64	5.93	"80-81	9.41	65.08	6.92
"66-67	7.97	53.58	6.72	"81-82	8.26	67.88	8.22
"67-68	8.80	63.20	7.18	"82-83	7.37	59.57	8.08

সাল	পাট চাষে জমি	উৎপাদিত ফসল	হেক্টর প্রতি ফলন	সাল	পাট চাষে জমি	উৎপাদিত ফসল	হেক্টর প্রতি ফলন
"83-84	7.47	62.76	8.40	"91-92	8.65	88.51	9.89
"84-85	8.34	65.36	7.84	"92-93	6.03	63.12	10.47
"85-86	11.46	108.85	9.50	"93-94	6.95	73.60	10.59
"86-87	8.07	73.58	9.12	"94-95	7.39	79.97	10.82
"87-88	6.98	58.00	8.31	"95-96	7.37	76.75	10.41
"88-89	6.67	59.13	8.87	"96-97	8.74	97.51	11.16
"89-90	6.77	71.12	10.51	"97-98	8.73	96.79	11.09
"90-91	7.78	79.17	10.18				

অনিয়মিত শস্য উৎপাদনের এক ধারা পাটচাষের সঙ্গে যেন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। অর্থাৎ, এক বছরে পাট চাষ বেশী হলে, পরের বছর আবার কম উৎপাদন হয়।

সারণি ৯ ফলনের বিভিন্নতা অনুযায়ী কম ও বেশী উৎপাদনের বছর

কম উৎপাদনের বছর	বেশী উৎপাদনের বছর
1957-58	1958-59
1962-63	1961-62
1965-66	1964-65
1968-69	1967-68
1970-71	1969-70
1974-75	1973-74
1977-78	1975-76
1980-81	1981-82

[*সূত্র ঃ Goutam Sarkar : Jute in India এবং অন্যান্য*]

লক্ষ্যণীয়, যে বছরে প্রচুর ফলন হয় তার আগের বছর বা পরের বছরেই আসে চূড়ান্ত ব্যর্থতা।

অনিয়মের একটা বড় কারণ সঠিক বৃষ্টির অভাব। দেখা গেছে বর্ষার আগে বীজ রোপনের সময় বৃষ্টির কমবেশীর ওপর পাট চাষে নিয়োজিত জমি ভীষণ ভাবে প্রভাবিত হয়।

সারণি-১০ বর্ষাপূর্ব বৃষ্টি এবং পাট চাষ অঞ্চল — পশ্চিমবঙ্গে

সাল	বৃষ্টি (বর্ষার আগে)	পাটচাষ অঞ্চল (গত মরশুমের তুলনায় কত শতাংশ)
'75-76	– 39	– 9.46
'76-77	0	+ 31.52
'77-78	+ 28	+ 8.55
'78-79	– 1	+ 12.41
'79-80	– 72	– 6.26
'80-81	+ 8	+ 21.04
'81-82	+ 107	– 17.12

সাল	বৃষ্টি (বর্ষার আগে)	পাটজাত অঞ্চল (গত মরশুমের তুলনায় কত শতাংশ)
'82-83	– 15	– 13.26
'83-84	0	+ 5.63
'84-85	– 30	+ 15.40
'85-86	– 38	+ 36.60
'86-87	+ 40	– 29.28
'87-'88	– 11	– 18.12

তথ্য সূত্র ঃ Raw Jute : The Emerging Challenge, Amitava Majumder. Business Standard. 4th-5th Dec, 1990.

একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ দাবি করে, তাহল ৪০-এর দশকের প্রায় প্রথমদিক থেকে একর প্রতি ফলনের স্থিতি শীল হারে বৃদ্ধি। এর কারণ কী তা আমরা ঠিক জানতে পারিনি তবে মনে হয় অনেকগুলি ব্যাপার হয়ত একসঙ্গে কাজ করছে। — যথা আভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে কাঁচা পাটের দাম আশাব্যঞ্জক হওয়ায় চাষীদের উৎসাহ কিছুটা হলেও হয়ত বেড়েছে। আবহাওয়ার অনুকূলতাও হয়ত উৎপাদন বৃদ্ধির একটি কারণ হতে পারে। এরই সাথে হয়ত কাজ করছে সার, উন্নত বীজের প্রয়োগ। এছাড়াও আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন—তা হল গত তিন বছর ধরে কাঁচা পাটের দাম কেবলমাত্র একবারই মিনিমাম্ সাপোর্ট প্রাইসের (M S P) নিচে গেছে।

ভারতে যে মানের পাট হয় তাকে বিভিন্ন কৃত্রিম পদ্ধতির সাহায্যে হয়ত উন্নত মানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রান্তিক অর্থাৎ যাদের জমির পরিমান ২ হেক্টরের বেশী নয়, চাষীরাই মোট চাষযোগ্য জমির ৫৬ শতাংশ চাষ করে। এদের কোনো পুঁজি নেই, স্বপ্ন নেই, উদ্যোগ নেই। এদের পক্ষে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ অসম্ভব।

সারণি-১১ জমির পরিমাণ অনুযায়ী চাষীদের ভাগ

	চাষের জমির পরিমাণ (০০০)	শতাংশ
প্রান্তিক (1 হেক্টরের কম)	227	28
ছোট (1-2 হেক্টর)	230	28.4
ছোট মাঝারি (2-4 হেক্টর)	214	26.4
মাঝারি (4-10 হেক্টর)	104	12.9
বড় (10 হেক্টর ও তার বেশি)	35	4.3

[তথ্য সূত্র ঃ Raw Jute : The Emerging Challenge, Amitava Majumder. Business Standard, 4.12.90]

এছাড়াও নেই উচ্চমানের বীজ এবং যথেষ্ট সেচযোগ্য জমি। এখনও ভারতবর্ষের মোট পাটচাষের নিয়োজিত জমির মাত্র ১৬ শতাংশ সেচ ব্যবস্থার অধীন।

পাটের গুণমান নির্ভর করে অনেকটাই রেটিং-এর ওপর। অর্থাৎ মাঠ থেকে পাট তোলার পর তা ধোওয়ার পদ্ধতির ওপর। স্বাধীনতার আগে পূর্ববঙ্গে নদী, ছোট ছোট খাল ইত্যাদিকে ব্যবহার করা হত রেটিং-এর কাজে। এখনও বাংলাদেশে রেটিং-এর সময় অগাস্ট থেকে অক্টোবর বৃষ্টি কম হলে পাটের গুণমান প্রভাবিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণভাবে ডোবাকেই ব্যবহার করা হয় রেটিং-এর কাজে। স্বাভাবিকভাবেই পাটের মান কখনই উন্নত হয় না। যান্ত্রিক এবং মাইক্রো-বায়োলজিক্যাল পদ্ধতি প্রয়োগে এই সমস্যা হয়ত দূর করা যায় কিন্তু এখনও পশ্চিমবঙ্গে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না। এছাড়া কম জমিতেই লাইন রোয়িং (line rowing) ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ■

পাট শিল্প — নানান দেশে

এবার চেষ্টা করা যাক আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও কাঁচাপাটের ব্যবহারের একটি বিশ্লেষণ তৈরি করার। এই বিশ্লেষণ আন্তর্জাতিকভাবেই এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্দেশ করবে এবং ভারতবর্ষের সঠিক অবস্থানও চিনিয়ে দেবে। এই উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকটি সারণি ব্যবহার করব — প্রথমটি (সারণি ১২) মুখ্য পাট উৎপাদনকারী দেশে পাট উৎপাদন, জমির আয়তন ও ফলনের হিসেব; দ্বিতীয়টি সারা পৃথিবীব্যাপী পাটজাত পণ্যের উৎপাদন সংক্রান্ত (সারণি ১৩); তৃতীয়টি হল সারা পৃথিবীব্যাপী রপ্তানি সংক্রান্ত (সারণি ১৪) ; চতুর্থটি কাঁচা পাট ও মেস্তা জাতীয় আঁশ-এর ব্যবহার সংক্রান্ত (সারণি ১৫)।

সারণি ১২	Area, production and yield of jute/mesta in major producing countries					
	BANGLADESH	**CHINA**	**INDIA Jute/Mesta**	**MAYANMAR**	**NEPAL**	**THAILAND Jute/Kenaf**
AREA (th. ha)						
1994-95	567.8	175.0	838.0	37.5	9.0	89.7
1995-96	519.2	146.5	846.0	47.3	10.2	79.3
1996-97	547.6	147.0	1014.0	43.3	11.2	76.5
1997-98	698.1	162.1	1115.0	34.1	11.0	74.5
1998-99	477.5	92.7	1000.0	37.3	12.3	69.7
1999-2000	355.3	65.8	905.0	37.0	11.7	36.9
YIELD (tonne/ha)						
1994-95	1.81	2.03	1.76	0.92	1.30	1.45
1995-96	1.26	2.53	1.72	0.91	1.48	1.45
1996-97	1.94	2.48	1.81	0.91	1.26	1.43
1997-98	1.78	2.65	1.79	0.97	1.41	1.43
1998-99	1.78	2.68	1.84	0.90	1.24	1.46
1999-2000	1.75	2.67	1.79	0.81	1.20	1.52
PRODUCTION (th. tons)						
1994-95	1027.4	354.9	1476.0	34.6	11.7	130.3
1995-96	652.7	371.2	1458.0	43.0	15.0	114.9
1996-97	1062.2	364.9	1836.0	39.5	14.0	109.3
1997-98	1242.7	429.5	2000.7	33.1	15.5	106.4
1998-99	851.9	248.0	1841.0	33.5	15.2	101.7
1999-2000	630.0	176.0	1621.6	30.0	14.0	55.9

Source : FAO, Rome

সারণি ১৩	World production of jute goods				Unit : 000/M. Tons
	1991	1992	1993	1994	1995
WORLD	**3184.6**	**3152.5**	**3137.9**	**3022.3**	**3008.8**
DEVELOPING	**3078.4**	**3067.2**	**3060.8**	**2951.6**	**2945.7**
Africa	50.8	48.1	48.5	46.9	41.3
Ghana	2.3	2.3	1.3	1.0	–
Nigeria	2.3	3.9	3.9	1.9	1.9
Latin America	55.8	67.9	55.9	49.7	39.5
Brazil	22.6	35.2	29.8	23.8	23.7
Cuba	26.7	26.7	21.4	21.4	10.7
Near East	45.3	39.1	37.3	32.9	40.2
Egypt	19.3	19.3	16.0	20.8	21.4
Iran	16.4	8.5	7.7	1.5	5.0
Far East	2926.5	2912.1	2919.1	2822.1	2824.7
Bangladesh	558.4	617.6	566.4	573.6	524.4
China	696.6	550.4	571.8	499.5	535.0
India	1360.7	1437.2	1499.5	1498.1	1506.2
Indonesia	11.4	10.7	10.7	10.7	10.7
Myanmar	14.8	18.4	19.9	27.2	28.7
Nepal	18.1	13.9	16.0	16.0	16.0
Pakistan	108.0	104.2	81.9	73.2	76.9
Thailand	137.3	133.7	130.5	97.8	101.6
DEVELOPED	**106.2**	**85.3**	**77.1**	**70.7**	**63.1**
North America	9.5	11.7	12.0	10.3	9.1
Europe	51.1	40.0	33.2	33.4	33.5
EC	25.7	25.7	24.6	24.5	24.5
Belgium-Lux	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
France	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
Germany	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
Greece	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Italy	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Portugal	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
United Kingdom	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7
Other Europe	25.4	14.3	8.6	8.9	9.0
Hungary	1.6	2.0	2.0	2.0	1.0
Poland	8.4	3.7	2.1	4.4	4.2
Former USSR	25.0	15.0	13.6	9.0	2.0
Oceania	5.8	5.1	5.0	5.4	4.8
Other developed	14.8	13.5	13.3	12.6	13.7
Japan	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7

Source : FAO, Rome

সারণি ১৪	World exports of products of jute, kenef and allied fibres				Unit : 000/M. Tons
	1992-93 1994-95 average	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
WORLD	**898.0**	**820.6**	**728.7**	**719.2**	**716.4**
DEVELOPING	**806.5**	**728.4**	**643.0**	**632.7**	**635.2**
Africa	0.7	0.5	1.0	1.1	0.7
Latin America	0.0	0.0	0.5	1.1	0.4
El Salvador	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
Guatemala	0.0	0.0	0.5	0.3	0.1
Mexico	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3
Near East	1.1	1.0	9.0	2.7	2.8
Egypt	0.1	1.2	1.0	1.0	0.5
Syria	0.2	0.3	1.0	1.0	0.5
Turkey	0.8	0.7	6.7	0.7	1.8
Far East	804.7	726.9	632.5	627.8	631.3
Bangladesh	484.5	427.9	409.6	343.9	432.2
China	45.6	29.9	16.7	14.7	6.9
India	205.0	219.4	180.7	245.4	173.0
Nepal	10.3	10.0	10.0	10.0	10.0
Thailand	51.6	24.7	11.7	9.8	6.7
DEVELOPED	91.4	92.2	85.7	86.5	81.2
North America	1.7	1.5	3.5	2.9	2.4
USA	1.7	1.5	3.4	2.8	2.4
Europe	68.2	78.9	70.2	71.5	66.9
EEC (15)	66.8	76.5	68.3	69.7	65.7
Belgium-Lux	36.5	42.2	38.8	38.2	40.1
France	4.6	3.2	2.8	2.6	2.9
Germany	5.4	4.7	4.4	4.5	5.5
Netherlands	14.0	18.3	13.3	14.7	8.5
UK	4.6	3.5	4.5	5.5	4.8
Oceania	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4
Australia	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4
Other Developed	2.4	1.4	1.6	1.7	1.5
Japan	2.4	1.4	1.6	1.7	1.5
Former USSR	18.3	10.0	10.0	10.0	10.0

Source : FAO, Rome

সারণি ১৫	World apparent consumption (jute kenaf) and allied fibres Unit : 000/M. Tons				
	1992-94 (average)	1995	1996	1997	1998
WORLD	**3279.7**	**3005.1**	**3014.3**	**3304.9**	**2965.7**
DEVELOPING	**2742.3**	**2494.3**	**2567.5**	**2860.8**	**2562.2**
Africa	**115.1**	**110.3**	**105.3**	**94.2**	**66.5**
Algeria	23.9	11.9	10.8	9.4	9.4
Ghana	4.8	5.7	13.5	10.7	8.3
Kenya	8.7	10.5	0.7	0.6	0.8
Morocco	6.4	14.1	17.8	5.5	1.2
Tanzania	8.3	5.0	5.1	4.3	3.4
Zimbabwe	4.7	7.6	2.8	6.3	5.7
Latin America	**70.6**	**70.1**	**64.0**	**68.5**	**57.5**
Argentina	3.6	5.1	5.0	4.7	5.5
Brazil	35.2	32.8	21.2	27.6	17.1
Mexico	3.7	5.0	4.4	5.7	3.0
Near East	**265.9**	**239.6**	**234.8**	**264.3**	**263.2**
Egypt	28.8	31.0	29.7	30.1	36.3
Iran	55.6	25.5	47.3	65.7	48.5
Syria	59.8	55.0	58.5	54.2	44.4
Turkey	37.0	53.3	53.0	61.4	71.1
Sudan	68.8	56.3	30.5	39.4	52.6
Far East	**2290.7**	**2074.3**	**2163.4**	**2433.8**	**2175.0**
Bangladesh	145.2	150.4	158.1	143.7	122.2
China	489.1	272.6	369.2	582.1	348.0
India	1340.7	1317.7	1411.6	1513.4	1521.4
Indonesia	42.4	13.6	18.4	9.2	8.1
Pakistan	89.8	63.5	90.6	83.6	81.4
Myanmar	41.3	38.0	27.6	28.9	30.8
Thailand	96.8	89.5	59.2	32.7	28.9
DEVELOPED	**537.4**	**510.8**	**446.8**	**444.1**	**403.5**
North America	**99.1**	**106.4**	**69.7**	**81.1**	**79.8**
United States	92.1	98.2	60.0	74.1	72.8
Europe	**276.4**	**256.0**	**255.3**	**235.2**	**198.4**
EEC (15)	**261.6**	**243.6**	**240.3**	**221.6**	**189.3**
Belgium-Lux	107.7	106.2	101.6	89.0	68.2
Germany	20.4	20.6	20.2	16.0	16.3
Netherlands	18.3	15.3	25.7	18.5	21.9
United Kingdom	52.1	44.5	44.5	48.7	37.4
Former USSR	**50.1**	**39.0**	**28.9**	**26.4**	**26.4**
Ocenia	**53.7**	**52.4**	**44.6**	**56.2**	**59.7**
Australia	48.2	46.1	39.5	45.0	44.9
New Zealand	5.4	6.3	5.1	11.1	14.8
Other Developed	**58.1**	**57.0**	**48.3**	**45.2**	**39.2**
Japan	52.5	50.1	41.6	38.7	30.9

সারণি ১২ থেকে যাচ্ছে যে অন্য দেশের তুলনায় ভারতে অনেক বেশী জমিতে পাট চাষ হচ্ছে কিন্তু ফলন চীনে উল্লেখযোগ্য রকম বেশী। বাংলাদেশেও গত পাঁচ বছরে চাষের জমি ও উৎপাদন বেশ কমেছে।

সারণি ১৩ থেকেআমরা দেখতে পাই সারা বিশ্বে পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের একটা স্থিতিশীল অবস্থা। একমাত্র ব্যতিক্রম ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ। চীন ১৯৮০-তে উৎপাদন শুরু করে আটের দশকের শেষের দিকে একটা দারুণ উচ্চতায় পৌঁছলেও ১৯৯২ থেকে তা আবার কমতির দিকে।

সারণি ১৪-তে দেখতে পাই আন্তর্জাতিকভাবেই রপ্তানির পরিমাণ কমছে। ভারতবর্ষের রপ্তানির সেই একই চিত্র। বাংলাদেশের অবস্থা ভারতবর্ষের থেকে ভাল হলেও রপ্তানি বাণিজ্যে ক্ষয় সেখানেও লক্ষণীয়। ১৯৯৭-৯৮ সালে ভারতবর্ষের রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়লেও তার সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় এখনও আসেনি। যদিও শতকরা হিসাবের সারণিটি রপ্তানি বিশ্বে ভারতবর্ষের একটা স্থিতিশীল শতকরা হারকেই নির্দেশ করে।

চতুর্থ সারণি (সারণি ১৫) বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে কাঁচাপাট ও মেস্তাজাতীয় আঁশের ব্যবহারে সারা পৃথিবী একটা মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল জায়গায় পৌঁছে গেছে। শুধুমাত্র ভারত ও বাংলাদেশে ব্যবহার বেড়েছে। এর অর্থ, অন্যান্য দেশগুলিতে ব্যবহার কমছে।

ওপরের তথ্য থেকে একথা স্পষ্ট যে পাটজাতদ্রব্যে ভারতের উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে যদিও তা আভ্যন্তরীণ বাজার নির্ভর। আন্তর্জাতিকভাবে শিল্পটির ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। বিশ্বের বাজারে পাটজাতদ্রব্যের ব্যবহার বাড়াতে না পারলে শিল্পটির গায়ের বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্ন সহজে তুলে ফেলা যাবে না।

ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজার সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে যে কতগুলি শিল্পে যেমন পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ছে তেমনি কমছে অন্য কতকগুলি শিল্পে। সিমেন্ট ও সার শিল্পে প্রতিযোগী হিসাবে হাজির হয়েছে সিন্থেটিক। পরিবেশ আন্দোলন সত্ত্বেও ১৯৯৭-৯৮ অবধি সিমেন্ট ও সার প্যাকেজিং-এ সিন্থেটিক ব্যবহার বাড়ছেই। এ প্রসঙ্গে একথা খেয়াল রাখতে হবে যে বিগত কয়েক বছরে ভারতে বেশ কিছু পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প তৈরী হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল সদ্য চালু হয়ে গিয়েছে। সেই হিসাবে আভ্যন্তরীণ বাজারে আগামী কয়েক বছরে পাটজাত দ্রব্য কি আরও কঠোর প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হবে? যদিও সরকার প্যাকেজিং আইন, বাধ্যতামূলক ক্রয় ইত্যাদির দ্বারা একে সুরক্ষিত রাখার ঘোষণা করে চলেছে।

সারণি ১৬ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার (০০০ মেট্রিক/টন)

সময় (এপ্রিল-মার্চ)	খাদ্যশস্য	চিনি	সিমেন্ট	ইউরিয়া
১৯৯৩-৯৪	৪৫০	১৫৭	৯	৮১
১৯৯৪-৯৫	৩৮৫	২০৫	১	৮৫
১৯৯৫-৯৬	৪০৬	২১৫	০.৪	৫৩
১৯৯৬-৯৭	৩৭৫	২২৩	০.১	৫৭
১৯৯৭-৯৮	৫৪০	২১৪	০.১	৬৯

সারণি ১৭	**Actual Export of Jute Goods**											Qty. 000/M Tons
Period Apr-March	Hessian		Carpet Backing Cloth		Sacking		Yarn		Others		Total	
	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value
1994-95	105.4	228.63	27.1	64.76	6.2	12.62	65.6	129.45	6.0	51.53	210.3	486.99
1995-96	124.5	357.67	23.2	63.74	7.2	18.04	59.0	134.59	4.2	60.79	218.1	634.83
1996-97	76.0	292.81	15.4	50.19	6.7	20.26	51.3	134.31	5.6	74.81	155.0	572.38
1997-98	103.5	294.24	13.5	40.70	17.9	40.59	95.4	231.96	9.7	87.21	240.0	694.70
* 1998-99	65.3	199.39	15.3	46.87	8.0	20.45	69.5	185.40	12.9	130.19	171.0	582.30
* 1999-2000	56.1	186.47					65.8	177.53				513.69
* Provisional												
(Source : DGCI & S, Kolkatta)												

Export of other jute goods												Qty. 000/M Tons
Period April March	Canvas Tarp. & Twine	Webbing	Soil Saver	Felt	Deco Fab.	Dyed Fab.	Carpet	Floor Covering	Blanket	Wall Hanging	Shopping Bag	Anyother	Total
1994-95	2.33	0.96	1.38	0.21	1.08	–	–	18.20	0.02	5.62	14.34	7.39	51.53
1995-96	0.93	1.39	1.44	0.08	4.31	–	–	27.71	0.13	4.10	13.95	6.76	60.79
1996-97	1.35	1.33	2.77	0.01	5.66	–	–	29.18	0.28	3.32	20.98	9.92	74.81
1997-98	1.94	2.10	3.82	0.37	5.67	–	–	34.59	0.42	3.89	16.12	18.25	87.17
*1998-99	2.78	1.04	4.04	0.28	4.95	–	–	54.23	0.85	5.58	19.08	37.36	130.19
*1999-2000 (April-Sept.'99)	0.75	1.76	2.97	0.15	1.23	–	–	18.34	0.79	3.66	10.41	14.88	54.94
* Provisional													
(Source : DGCI & S, Kolkata)													

এবার আমরা দেখব কোন ধরণের পাটজাত দ্রব্য কতটা রপ্তানি হয়।

এই সারণিটি (১৭) আরেকটি আশঙ্কা আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে। পাশাপাশি ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৮-এর তথ্য বিশ্লেষণও একথা সামনে নিয়ে আসে যে value added product (অর্থাৎ যে সব দ্রব্যের সাথে শ্রমিকদের ঘাম রক্ত ও প্রায়োগিক অনেক জ্ঞান বেশী মিশে আছে) গুলির রপ্তানি কমছে। হেসিয়ান ও স্যাকিং-এর রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে। বেড়েছে সুতোর (yarn) রপ্তানি। গত কুড়ি বছরে সুতোর রপ্তানি বেড়েছে দশগুণ। এই প্রবণতা চলতে থাকলে রপ্তানি বাণিজ্যের অর্থমূল্য উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যাবে। তা শিল্পের পক্ষে কখনই শুভ নয়। শ্রমিকদের কাছেও এই সংবাদ আশঙ্কার। কারণ অনেক মিলের মধ্যেই তৈরী হচ্ছে ছোট ছোট কিছু রপ্তানিকেন্দ্রিক yarn unit অস্থায়ী শ্রমিকদের adhoe payment-এর ভিত্তিতে। ■

পাট শিল্প — শ্রমিকদের অবস্থা

চটকলে নিযুক্ত শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে যখন আমরা চর্চা করি, কারখানার লাগোয়া শ্রমিক বস্তিগুলিতে যখনই আমরা ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্যে গিয়েছি, তখনই মনে হয়েছে এ এক অন্য ভুবন। আলোহীন, বাতাসহীন, কোথাও কোথাও জলহীন, শ্রীহীন এই বস্তিগুলিতে কর্মহীন অথবা অধিক কর্মে শ্রমিকরা ধুঁকছে, ধুঁকছে তাদের পরিবার। অন্ধকারে ডুবে থাকা এই শ্রমিকদের ইতিহাস এক উজ্জ্বলতা থেকে অন্ধকারে যাবার ইতিবৃত্ত নয়, অন্ধকার থেকে যেন আরও অন্ধকারে ডুবে যাবার ইতিহাস।

একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে এই চটশিল্পে বৈভব এসেছে, প্রাচুর্য্য এসেছে, শ্রমিক সংখ্যা বেড়েছে—কিন্তু শ্রমিকের দুর্দশা ও সংকট যে তিমিরে সেই তিমিরেই। ১৯০০ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে চটকলগুলির শ্রমিকদের গড় বেতন ছিল ১৫ টাকা ২ পয়সা। তুলনায় বোম্বে ও আমেদাবাদের সূতাকলের শ্রমিকদের গড় বেতন ছিল যথাক্রমে ২৩ টাকা ৭১ পয়সা এবং ২৩ টাকা ২১ পয়সা।

স্বাধীনতার ঠিক পরে ১৯৪৮ সালে শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন আমরা দেখি ৪৬ টাকা (১৮টাকা বেসিক+২৮টাকা ডি এ)। এই শিল্পে প্রথম ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় ১৯৪৮ সালে। এই ট্রাইব্যুনাল অভিমত দেয় লিভিং ইনডেক্স ৩২৫ ধরে, চটকল শ্রমিকদের মাইনে হওয়া উচিত ৭১ টাকা। মালিকদের সংগঠন (আই জে এম এ) এটা কিছুতেই মেনে নিতে চায় না। শেষ পর্যন্ত মাইনে নির্ধারিত হয় ৫৮ টাকা (২৬ টাকা মূল বেতন + ৩২ টাকা মহার্ঘভাতা)। তবে মেনে নিতে হল সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার কাজকে। সাপ্তাহিক কাজের সময় যেই নামিয়ে আনা হল ৪২ ঘন্টায়, বেতনও নেমে এল ৫২ টাকা ১২ পয়সায়। ১৯৫১ সালে গঠিত হয় দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল। এই ট্রাইব্যুনাল ৬৩ টাকা ৬০ পয়সা বেতন দেবার জন্য সুপারিশও করে। এই সুপারিশও মালিকরা যথারীতি মেনে নেয় না। মাইনে রফা হয় ৫৬ টাকায়।

এই ট্রাইব্যুনালগুলির অভিমত অনুযায়ী যে ন্যূনতম বেতন কার্যকরী হয় তা কেবল মাত্র স্থায়ী কর্মীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। যে সব শ্রমিক উইণ্ডিং, উহভিং, বীমিং এবং সিউয়িং বিভাগে কাজ করে পীস রেটে তাদের ক্ষেত্রে কোনো নতুন বেতনক্রম চালু হয় না। ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বেতন নির্ধারণের এই যে রীতি তা শেষ হয় ১৯৬৩ সালে, জুট ওয়েজেস বোর্ড (Jute Wages Board) সংগঠনের মাধ্যমে। ট্রাইব্যুনালের সুপারিশে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারটা মালিকপক্ষ কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত যে বেতন নির্ধারিত হচ্ছিল তা সুপারিশের পরিমাণের থেকে কম।

১৯৬৮ সালে চটশিল্পের সংকটের ওপর একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চটকলের মালিকরা প্রায় সকলেই শ্রমিকদের

বেতনের পরিমাণে তাদের আপত্তির কথা জানান, এই শিল্পের সংকটের অন্যতম কারণ হিসেবে শ্রমিকদের অতিরিক্ত বেতনকে অনেকেই চিহ্নিত করেন। মালিকদের এই বেতন দিতে অনীহার জন্য শ্রমিকদের লড়াই করে সব আদায় করতে হয়েছে।

লক্ষণীয় হল ১৯৯৬-তে জুট শিল্পে শেষ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়। এবং চুক্তির পরে স্বাক্ষরকারী এমন মিলগুলিতেও নির্ধারিত মজুরী দেওয়া হয় না। চুক্তির মেয়াদ শেষে জুট মিল কর্তৃপক্ষ এবং আই জে এম এ-র পক্ষে জানানো হল তাঁরা শিল্পভিত্তিক চুক্তিতে আর রাজী নন এবার তাঁরা উৎপাদন ভিত্তিক (শ্রমিক পিছু) বেতন কাঠামো করতে চান। মিলভিত্তিক চুক্তির স্বপক্ষে স্থানীয় স্তরে শ্রমিক সংগঠন ভাঙ্গাগড়ার মাধ্যমে সমর্থন/বিরোধিতার এক নৈরাজ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।

চটশিল্পে বাণিজ্যিক সংকট যত বেড়েছে, ততই কমেছে শ্রমিকের লড়াইয়ের তীব্রতা, বেড়ে গেছে মালিকের বঞ্চনা আর শোষণ।

আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা উল্লেখ করেছি যে চটশিল্পের বাণিজ্যিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার যে সব বিকল্প সম্ভাবনাগুলি মালিকদের সামনে ছিল, যেমন শিল্পের আধুনিকীকরণ, শুধুমাত্র একধরণের উৎপাদন তৈরি না করে আরও ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন তৈরি করে নতুন নতুন বাজারের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো ইত্যাদি—মালিকরা সে পথে না গিয়ে কিন্তু বেছে নিল সবচেয়ে সহজ পথটিই — শ্রমিকদের অর্জিত অধিকারে থাবা বসিয়ে সংকট থেকে নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা।

চটশিল্প পত্তনের একেবারে শুরুর পর্যায়ে বাঙালী শ্রমিকদের আধিক্য থাকলেও শিল্প সম্প্রসারণের সাথে সাথে এই শিল্পে ক্রমবর্ধমান শ্রমিকের চাহিদা মেটাতে ভীড় করতে লাগলেন যাঁরা তার বেশীর ভাগই ভিন প্রদেশের মানুষ। ১৯২৯-এর যে হিসেব আমরা পাই তাতে দেখা যায় মোট শ্রমিকের ২৪% পশ্চিমবঙ্গ, ৩৩% বিহার, ২৩% উত্তরপ্রদেশ (যুক্তপ্রদেশ), ১০% উড়িষ্যা, ৪% মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশ, এবং ৩.৩% অন্যান্য। সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে।

সমস্ত শিল্পেই যে রকম হয়েছে, যেমন কয়লা শিল্প ইত্যাদির মতনই, চটশিল্পেও প্রথম আঘাত এসে লাগল মহিলা শ্রমিকদের ওপর। চটশিল্পে সেলাই বিভাগ ইত্যাদিতে মহিলাদের আধিক্যের জন্য একসময় সেলাই বিভাগকে চলতি কথায় 'মাগী' কলও বলা হত। '৭০ দশক পর্য্যন্ত যে হিসেবে দেখা যায় মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। বর্তমানে এই শিল্পে মহিলা কর্মীর সংখ্যা এক হাজারেরও কম।

মহিলা কর্মীর সংখ্যা কমানোর সাথে সাথে উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে শ্রমিকের ওপর বাড়ানো হল কাজের চাপ। প্রাথমিক ভাবে শ্রমিকদের কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে উৎপাদনের খরচ কমানোর প্রচেষ্টা চালায় মালিকরা।

১৯৫১ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্য্যন্ত একটা হিসেব একটু লক্ষ্য করা যাক—

সারণি ১৮	শ্রমিক পিছু পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন		
বছর	পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন (হাজার টন)	শ্রমিক সংখ্যা (লাখ)	শ্রমিক পিছু উৎপাদন
1951	888.1	279	3.18
1956	1110.3	253	4.39
1960	1084.2	208	5.21
1965	1335.3	248	5.38
1970	954.2	223	4.28
1975	989.8	246	4.02

বছর	পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন (হাজার টন)	শ্রমিক সংখ্যা (লাখ)	শ্রমিক পিছু উৎপাদন
1979	977.6	221	4.42
1991	1278.2	241.5	5.29
1994	1374.2	238	5.77
1996	1400.9	232	6.04
1997	1678.4	232	7.23

[সূত্র ঃ *IJMA (i) Annual Summary of States Gunny statistics, (ii) Report of the Committee*]

এইভাবেই শ্রমিক পিছু উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধিতে শ্রমিকের ওপর নেমে এসেছে অমানুষিক কাজের চাপ।

আই জে এম এ — অর্থাৎ চটকল মালিকদের সংগঠনের যে সূত্র থেকে সারণি করা হয়েছে তাতে বিভিন্ন বছরে শ্রমিক সংখ্যার তারতম্য খুব একটা বেশী নেই। কিন্তু আমরা অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমে শ্রমিক সংখ্যার ক্রমাবনতির মাত্রা লক্ষ্য করি। শ্রী শিশির মিত্রের 'গোল্ডেন ফাইবার' হইতে যে তথ্য পাই তা এরকম; চটকল শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৫১ সালে ২৫৫,৫৮১ জন, ১৯৬১, ১৯৭১, ১৯৮১, এবং ১৯৯১ এ সেই শ্রমিক সংখ্যা হয়েছে যথাক্রমে ১৯২,১৩০; ২১১,৫৪৭; ১৮০,০০০; এবং ১৭০,০০০ জন শ্রী অমিয় কুমার বাগচী ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি (EPW)-এর ৪৭-৪৮ সংখ্যা ১৯৯৮-তে তথ্যসূত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন, "The employment fell between 20 and 33 percent over the year 1984-1990."

পাঠকরা হয়ত ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন যে বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া শ্রমিক সংখ্যার মধ্যে অমিল রয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রতিবছরই মিল ম্যানেজমেন্টগুলির শ্রমিক সংখ্যা, উৎপাদন ইত্যাদির একটি রিটার্ন দেওয়ার কথা সরকারকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের চটকল মালিকরা কখনই সঠিক রিপোর্ট দেয় না। এর পেছনেও উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যটি এইরকম—যদি শ্রমিক সংখ্যা কম দেখানো যায়, তবে সেই অপ্রকাশিত শ্রমিক দ্বারা উৎপাদিত উৎপাদনকেও চেপে দেওয়া যায়, দেওয়া যায় বিভিন্ন রকম কর ফাঁকি। এছাড়া শ্রমিক সংখ্যার গরমিলের পেছনে রয়েছে সম্ভবতঃ আরেকটি কারণ—চটকলগুলিতে যে ব্যাপক পরিমাণে লেবার রেজিস্টার বহির্ভূত কর্মী রয়েছে সেই সংখ্যা গোপন রেখে এই সমস্ত কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা আইনের আওতার বাইরে রেখে দেওয়া।

'৮০-র দশকের প্রথম দিকে চটশিল্পে সংকটের মোকাবিলার নামে সংশ্লিষ্ট মালিক কর্তৃপক্ষ বেছে নিয়েছিল সহজ উপায়—শ্রমিকের মজুরি সংকোচন।

'৯০-এর দশক জুড়ে শুরু হল সংকটের ধূয়ো তুলে মিল বন্ধ করে চাপ সৃষ্টি করে কাজের বোঝা বাড়ানো।

১৯৫১ থেকে '৯১, এই ৪০ বছরে কাজের বোঝা বেড়েছিল ১৫০%, ১৯৯১ থেকে '৯৬ এই পাঁচ বছরে কাজের বোঝা বেড়েছে ৬০০% । এমনকি ট্রেনি নাম দিয়ে বিনা মজুরির মজুর নিয়োগ চলতে থাকল। পাশাপাশি চটের সেলাই বিভাগে বা কাঁচা পাট বাছাই করার কাজে নিযুক্ত স্থায়ী কর্মচারি হটিয়ে কম টাকায় কনট্রাক্ট প্রথায় শ্রমিক নিয়োগ চলছে। এ প্রথায় কন্ট্রাক্টারের ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসছেন কিছু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা।

কাজের মাত্রার পরিমাণে আমরা অন্যরকম আরেকটা হিসেব নিতে পারি। ১৯৭৬ সাল থেকে আমরা চটশিল্প সহ অন্যান্য শিল্পে দুর্ঘটনার একটা তুলনামূলক সারণি ব্যবহার করছি।

সারণি-১৯	শিল্প দুর্ঘটনা			
সাল	পাট	ইঞ্জিনিয়ারিং	সূতা	রাসায়নিক
1976	149.98	59.99	141.31	–
1977	149.06	59.74	100.38	–
1978	159.89	51.42	105.15	34.27
1979	144.44	43.56	117.07	31.19
1980	177.14	48.80	114.82	33.27
1981	205.12	40.92	127.12	34.84
1982	194.59	38.95	155.90	31.94
1983	216.02	39.76	161.43	31.08
1984	248.07	25.00	154.70	20.42
1985	228.55	30.53	125.11	27.91
1986	235.91	36.30	146.10	34.98
1987	177.81	34.11	106.75	12.91
1988	161.26	23.33	92.35	17.50
1989	179.06	19.59	83.70	28.02
1990	155.55	17.05	94.24	14.01
1992	102.07	22.80	114.19	13.09
1993	141.56	33.17	129.20	15.00
1994	92.23	35.07	118.76	14.47
1995	112.61	31.06	122.41	12.91
1996	103.72	13.68	76.48	23.24

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পের সাথে তুলনায় ১৯৯৪-১৯৯৫ সালের একটা হিসেবে আমরা দেখি যে চটশিল্পে মোট দুর্ঘটনার সংখ্যা ২৯,৯৫৭ যা সারা দেশের মোট শিল্প দুর্ঘটনার ৫৭%।

আমরা লক্ষ্য করেছি চটশিল্পের দুর্ঘটনার মাত্রা ১৯৯১ সাল থেকে একটু কম পরিমাণে হলেও, অন্যান্য শিল্পের তুলনায় চটশিল্পে দুর্ঘটনার পরিমাণ অত্যধিক। এই সারণি থেকে আমাদের মনে হয়েছে অন্যান্য শিল্পের তুলনায় চটশিল্পে শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা অপ্রতুল, এব্যাপারে মালিকপক্ষ অর্থ বিনিয়োগ একদমই করেনি। সরকার তার আইনী চক্ষু একেবারেই বন্ধ করে বসে আছে। অত্যধিক কাজের চাপের মাত্রা শ্রমিককে তাই দুর্ঘটনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে এত সহজভাবে। বিভিন্ন চটকলের শ্রমিকদের সাথে আমরা যখন কথা বলেছি (কানোরিয়া, বরানগর, হুকুমচাঁদ) তাদের কথাতেও মনে হয়েছে কাজের চাপ সত্যিই বেড়ে গেছে। বরানগর চটকলে শ্রমিকদের সাথে কথা বলে জানা গেল যে স্পিনিং ডিপার্টমেন্টে এখন প্রতিদিন গড় উৎপাদন ৯০ মেট্রিক টন, উইভিং ডিপার্টমেন্টে ৯২-৯৩ মেট্রিক টন, ফিনিশিং ডিপার্টমেন্টে ৯৪-৯৫ মেট্রিক টন—যা ১৯৭৭ সালে ছিল ৫৬-৫৭ মেট্রিক টনের ভেতর। ১৯৭৭ সালে শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৭,০০০ সেখানে আজকে আছে ৪,০০০ জন। ১৯৯৯-এ টন প্রতি শ্রমিকের সংখ্যা ৪২। ম্যানেজমেন্ট টন প্রতি শ্রমিকের সংখ্যা আরও কমাতে চাইলেও বাস্তবে তা সম্ভব হচ্ছে না কারণ উৎপাদনের মাত্রা আর শ্রমিকদের সংখ্যার অনুপাত বোধহয় চূড়ান্ত সীমায় এসে গেছে। মালিক এবার তাই তার রণকৌশল বদলাল, মালিকের নজর এবার শ্রমিকের পকেটের ওপর, তার মজুরীর ওপর—মজুরী থেকে বঞ্চিত করার কৌশলগুলির মধ্যে দিয়ে চটকলের মালিকরা প্রায় ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেছে।

স্থায়ী শ্রমিকদের যেহেতু বেতন, সামাজিক নিরাপত্তার অনেক কিছুই চুক্তি সাপেক্ষ এবং অবশ্যপালনীয়, তাই মালিকরা সচেষ্ট হল চটকলগুলিতে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে দিতে। স্থায়ী শ্রমিকদের বদলে চটকলগুলি ভর্তি হয়ে উঠতে লাগল বিচিত্র সব নামের শ্রমিক দিয়ে। যেমন —

(১) স্পেশাল বদলী—২২০ দিন কাজ পেতে পারে। বেতন ছাড়া, শুধুমাত্র পি এফ-এর সুযোগ পায়। স্থায়ী শ্রমিকের মতো আর কোন সুযোগ পায় না।

(২) ভাউচার শ্রমিক—নিয়মিত পে রোলে এদের নাম নেই। সমস্ত বেতনটাই ভাউচারে হয়। পি এফ, ই এস আই ও অন্যান্য কোনো সুযোগ পায় না।

(৩) জিরো নাম্বার — অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক পি এফ-এর টাকা, গ্র্যাচুইটির টাকা না পেয়ে প্রতিদিনের রুটিরুজির সংস্থানে নাম লেখায় জিরো নাম্বারে। শুধুমাত্র দৈনিক বেতনই এদের ভরসা। ই এস আই বা পি এফ বা অন্য কোনো সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা এরা একদমই পায় না। এদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম। বরানগর চটকলে চুক্তির ধারা অনুযায়ী এদের বলা হয় ৪বি।

জিরো নাম্বার ওয়ার্কার বলতে অনেকেই শুধু বোঝেন শ্রমিক বঞ্চনার বিষয়টি। পাশাপাশি তলিয়ে দেখলে ধরা পড়ে যে এই জিরো নাম্বার ওয়ার্কার যে উৎপাদন করে তার কোনো রেকর্ড থাকে না। একইভাবে উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচা পাটের হিসেবও হিসাব বহির্ভূত থেকে যায়।

বঞ্চনা শুধু শ্রমিকের নয়, এটা শুধু শ্রম আইন না মানার ঘটনা নয়—সরকার ও নাগরিকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ রাজস্ব কর আদায় এই কায়দায় ফাঁকি পড়ে। গড়ে ওঠে কালো টাকাকে ঘিরে সমান্তরাল এক আর্থিক অনাচারের ব্যবস্থা।

(৪) ভাগাওয়ালা—চটকল ছাড়া এই ভাগাওয়ালা প্রথা আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। শ্রমিকের ওপর কাজের চাপ বাড়ছে, বিশেষ করে জিরো নাম্বার শ্রমিকদের কাছে এই কাজের চাপ অসহনীয়। নিজের বেতন থেকে সামান্য কিছু দিয়ে, আরও অভাগা কোনো বেকারদের দিয়ে শ্রমিকরাই নিজের বরাদ্দ কাজটি তুলে নেবার চেষ্টা করে। ভাগাওয়ালা শ্রমিকদের যেহেতু অফিস রেকর্ডে বেতন স্বীকৃতি নেই তাই কোনো রকম দুর্ঘটনা বা বিপদের দায় থেকে মালিকেরা নিজেদের মুক্ত করে রেখেছে।

(৫) ট্রেনী—এইসব ধরণের শ্রমিক ছাড়াও আরেক ধরণের শ্রমিক 'ট্রেনী' নাম দিয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে, পাঁচ বছরের চুক্তিতে সত্তর টাকা রোজে (যেমন হুকুমচাঁদে, বরানগরে, হনুমানে)।

(৬) কনট্রাক্ট লেবার—এদের সংখ্যা চটশিল্পে দিন দিন বেড়েই চলেছে। এদের শুধুমাত্র ই এস আই দিলেই হয়।

সরকারের মন্ত্রী পর্যায়ে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে চটশিল্পে শতকরা ৪০ ভাগও আর এখন আর স্থায়ী কর্মী নয়। এসব ছাড়াও বড় বড় মিলের মধ্যে ছোট ছোট কিছু এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইয়ার্ন (Export Oriented Yarn) তৈরি করার ইউনিট হয়েছে (যেমন হুকুমচাঁদ)। অ্যাড্-হক পেমেন্ট-এর ভিত্তিতে এখানে শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে।

বর্তমানে শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে দেবার ফলে সাহায্যকারী শ্রমিকের পরিমাণও কমে আসছে। এছাড়া নিম্ন মানের সুতো দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে বলে, সুতো বারবার ছিঁড়ে যাচ্ছে। এইসব কারণেও কাজের চাপ শ্রমিকদের বেশী পরিমানে বেড়ে গেছে।

স্থায়ী শ্রমিকেরাও পারছে কি তাদের মজুরীর ভাগ অটুট রাখতে? আমাদের প্রাপ্ত সূত্রগুলি কিন্তু অন্য কথা বলছে। ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসে যে সমগ্র চটশিল্পে ধর্মঘট হয় তার অন্যতম দাবী ছিল, ৯টি চটকলের ন্যূনতম বেতনের দাবী। যেখানে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরী ছিল ১৭৮৫ টাকা, নর্থ ব্রুক সেখানে দিত ১৫১৫ টাকা, তিরুপতি ৯৫০ টাকা, ইত্যাদি। সরকারের আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে তোয়াক্কা না করে বছরের পর বছর মালিকরা শ্রমিকদের ফাঁকি দিয়ে গেছে। শ্রমিকদের বেতন কমার তথ্যটি আরেক সূত্র থেকে আমরা সমর্থন পাই। মোট উৎপাদনের ব্যয়ে মজুরীর

অংশ '৮৭-৮৮ সালে ছিল ৫১%, '৯২-৯৩ সালে ৩৯%, ৯৫-৯৬ সালে ২৭%। চটশিল্পে মজুরীর প্রশ্নে শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য মোড় নিয়েছে ১৯৯২ সালে। এই সময়ে চটশিল্পে যে ধর্মঘট হয়, সেই ধর্মঘটে মিল -ভিত্তিক স্থানীয়ভাবে যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়, সেই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলিতে 'কাটাউতি' নামে নতুন প্রথা চালু হয়। চটকলগুলি লোকসানে চলছে এই অজুহাতে শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন থেকে একটা অংশ কেটে রাখা হতে থাকে।

সরকার নির্ধারিত হারে জানুয়ারী ২০০১-এ একজন চটশিল্পের শ্রমিকের ৮ ঘন্টা কাজের বিনিময়ে ২১০ টাকা মজুরী পাবার কথা।

কিন্তু 'প্রশ্ন এটাই' যে পায় কজন?

স্থায়ী বদলী এবং স্পেশাল বদলী সব মিলিয়ে এ ধরণের শ্রমিকদের পরিমাণ প্রতিটি মিলে ৫০ থেকে ৬০% এর বেশী নয়। বাকি সবই তো ভাউচার, জিরো, ভাগাওয়ালা, কন্ট্রাক্ট প্রথার শ্রমিক বা ট্রেনী।

ফাঁকি আরও আছে। শ্রমিকের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা শ্রমিক আর ফিরে পাচ্ছে না, ই এস আই - এর টাকা শ্রমিকের থেকে কাটা হচ্ছে কিন্তু জমা পড়ছে না। ১৯৯৯ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমগ্র চটশিল্পে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ই এস আই বাবদ বকেয়া টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ১৮০ কোটি টাকা এবং ৮০ কোটি টাকা। গ্র্যাচুইটি বাবদ শ্রমিকদের হকের পাওনা কতটা বকেয়া রেখেছে মালিকপক্ষ তার কোনো সঠিক পরিমাণ কারোরই জানা নেই। তবু অভিজ্ঞ মানুষের ধারণা শ্রমিকদের এই বকেয়া পাওনা কমবেশী ১২৫ কোটি টাকা। সরকার, রাজনৈতিক দলগুলি, সবাই এই অপরাধের থেকে চোখ সরিয়ে রেখেছে। অবসরের পরে শ্রমিকেরা তাই জিরো নাম্বারকে বাড়িয়ে চলেছে। মনে পড়ে যায় রক্তকরবীর নাটকের কথা। এই নাটকে আমরা দেখি শ্রমিকদের ব্যক্তি নাম আর ব্যক্তি পরিচয় হারাবার এক করুণ ট্রাজেডি। একশ বছর বাদেই সেই সংখ্যা বিশিষ্ট শ্রমিকরা তাদের পরিচয় জ্ঞাপক সংখ্যাকেও হারিয়ে জিরো বা শূণ্যে পরিণত হয়।

পুঁজিবাদী যুগে শ্রমিকের অস্তিত্বের পরিচয় যদি হয় ধর্মঘট, হরতাল, আর লড়াই, তাহলে কি সেই হিসেবে খুঁজে পাব শ্রমিকদের অস্তিত্বের পরিচয়? তাহলে দেখা যাক সেই দিকে—

সারণি-২০	স্ট্রাইক ও লকআউটের সালতামামি							
	স্ট্রাইক				লকআউট			
সাল	সংখ্যা	মোট শ্রমিক	মোট কতদিন নষ্ট	গড় দিন	সংখ্যা	মোট শ্রমিক	মোট কতদিন নষ্ট	গড় দিন
1974	11	216495	5305302	24.5	3	9800	238800	24.4
1975	8	268236	4761527	36.4	6	24142	357107	14.8
1976	14	7597	39004	5.1	31	100.695	4381763	43 5
1977	8	10.226	47.567	4.6	27	88.550	4531683	51.2
1978	3	725	9165	12.7	15	50.555	3770314	74.6
1979	3	2,45,764	1,01,59,991	41.3	3	14.000	1,47.000	10.5
1980	2	251	1464	6.0	9	33,902	5.84.737	17.2
1981	–	–	–	–	23	81.270	5362677	66.0
1982	2	84	534	6.4	22	75.353	10884950	144.5
1983	1	60	4.20	7.0	21	78267	9979633	127.5
1984	2	221084	15403312	69.7	11	37293	31.00.755	83.1
1985	–	–	–	–	21	79698	8651263	108.6
1986	1	4000	16000	4.0	20	83917	8225376	98.0

	স্ট্রাইক					লকআউট			
সাল	সংখ্যা	মোট শ্রমিক	মোট কতদিন নষ্ট	গড় দিন		সংখ্যা	মোট শ্রমিক	মোট কতদিন নষ্ট	গড় দিন
1987	1	25067	401072	16.0		25	98,829	11580496	117.2
1988	2	29167	1198182	41.1		20	79150	9870715	124.7
1989	–	–	–	–		24	76500	11852100	154.9
1990	–	–	–	–		21	65800	8172400	124.2
1991	–	–	–	–		18	73263	5813133	80.0
1992	9	1,74335	8326605	41.2		18	70650	7537100	86.4
1993	2	5000	50.000	–		24	86,000	75,20,000	–
1994	–	–	–	–		17	68.000	84,50,000	–
1995	1	2,25,000	9,00,000	–		16	48,000	19,10,000	–
1996	2	5000	70,000	–		22	81,100	44,40,000	–
1997	3	5000	1,60,000	–		12	44,000	1,91,00,000	–

[*সূত্র ঃ লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল*]

ধর্মঘট আর লকআউটের তুলনামূলক সালতামামি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে যতদিন গেছে ততই শ্রমিকরা তাদের আঘাত করার ক্ষমতাকে হারিয়েছে। মালিকপক্ষের আক্রমণের তীব্রতা দিনদিন বেড়ে গেছে। শ্রী অমিয় বাগচী ইকনমিক ও পলিটিকাল উইকলির (EPW; v. 47; Nov-Dec'98) একটি লেখায় বলেছেন "জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন কমতে থাকার এক অন্যতম কারণ হল অনেক কারখানায় ক্রমহ্রাসমান কর্মসংস্থান। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৮৭ থেকে '৯০-এর মধ্যে ১৫টি চটকলের ৪৫,০০০ শ্রমিক তাদের কাজ হারান।" ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনে চটকল শ্রমিকদের অবদান ছিল লড়াকু, জঙ্গী মনোভাবের। ক্রমশই যেন সেই মনোভাবটা বিলুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। সে দিকেই ইঙ্গিত করে ২০০০ সালের চট শিল্প ধর্মঘটের ব্যর্থতা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরোয়া না করে যেভাবে স্থানীয় ভাবে চটকলের ইউনিয়নগুলি ও মালিকেরা নিজেদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে ধর্মঘট ভেঙে কাজে অংশ গ্রহণ করেছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। পরিস্থিতির জন্য কে দায়ী সে আলোচনার স্থান এটা নয়। কিন্তু পরিস্থিতি এখানেই এসে দাঁড়িয়েছে। তবে এই সার্বিক অন্ধকারের মধ্যেও বারবার যে রূপালীরেখা ঝলসে উঠেছে সে বিষয়টার উল্লেখ না করলে আলোচনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেড-ইউনিয়নকে অস্বীকার করে কোথাও কোথাও চটকল শ্রমিকেরা তৈরি করেছে নিজস্ব সংগঠন, চালিয়েছে নিজস্ব লড়াই। এই লড়াই নানা কারণে ব্যর্থ হয়ে গেছে—তবুও চটকল শ্রমিকদের লড়াইয়ের এই ধারার অবদান শ্রমিক আন্দোলনে অনেকখানি, অনেকদিনই থেকে যাবে।

আমরা যে সর্বগ্রাসী অন্ধকার শব্দটি ব্যবহার করেছি তা শুধুমাত্র শব্দের অলঙ্কার নয়। নিষ্করুণ সত্য। চটকলের লাগোয়া যে বস্তি (যাকে কোয়ার্টার বলা হয়) তার চারপাশে একটু ঘোরাফেরা করলেই বোঝা যায় এই কথাটা কতটা বাস্তব। বেশীর ভাগ শ্রমিক-বস্তিতে পয়ঃপ্রণালীর অবস্থা শোচনীয়, হাজার মানুষের প্রতিদিনের মলমূত্র ত্যাগের কাজ চলে নামমাত্র কয়েকটি পায়খানায়। তাও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। চটকলগুলি লক-আউট বা ধর্মঘটে বন্ধ থাকলে এগুলো পরিষ্কারই হয় না। নৈহাটীর কাছে ক্যাভেন্ডার জুটমিল বন্ধ থাকার সময় দেখেছি শ্রমিক বস্তি থেকে মলমূত্রের গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। না আছে মালিকের হুঁশ, না পৌর কর্তৃপক্ষের হুঁশ। বরানগর চটকলে গিয়ে দেখেছি বর্ষাকালে বিশুদ্ধ জলের অভাবে পেটের ভয়ঙ্কর অসুখ সম্বৎসরের নিয়ম। ময়লা, ড্রেনের পচা জল, মলমূত্রের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে প্রতিদিন হাজার মানুষ; শিশুরাও বেড়ে উঠছে (?) এই পরিবেশে। এ এক নরক দর্শন! মজুরী, সামাজিক নিরাপত্তা যেমন শ্রমিকরা ক্রমশঃ হারাচ্ছে, তেমনই হারাচ্ছে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকারকে।

অবশ্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতার অভাবও এই নারকীয় পরিবেশের জন্য অনেকটাই দায়ী। ইউনিয়নগুলির কর্মসূচীর মধ্যে মজুরী বৃদ্ধির কথা যেভাবে এসেছে সেভাবে উঠে আসেনি সুস্থ পরিবেশে বাঁচার অধিকারের কথা (অবশ্য এই সমস্যাটি শুধুমাত্র চটকলেরই নয়! অন্যান্য শিল্পেও শুধুমাত্র মজুরীর প্রশ্ন ছাড়া স্বাস্থ্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ বা বিষয় খুব একটা গুরুত্ব পায়নি)। এর সাথে পাটশিল্পে যুক্ত হয়েছে ব্যাপক অশিক্ষা যার জন্য গড়ে ওঠেনি কোনো রকম স্বাস্থ্য সচেতনতা। এছাড়া চটকল শ্রমিকদের একটা বিরাট অংশ ভিন রাজ্যের হওয়ায়, তারা বছরের একটা বড় সময় দেশে থাকে, ক্ষেতি-জমিতে চাষ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কুলি লাইনের বাসস্থান হয়ে পড়ে তার এক অস্থায়ী ঠিকানা যেখানে সে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় দিনগত পাপক্ষয় করে কাটিয়ে দেয়, বাসস্থানের স্বাস্থ্য বিষয়টি তার কাছে হয়ে পড়ে গৌণ। ■

পাট শিল্প — সরকারি ভূমিকা

আমরা এতক্ষণ চটশিল্পের মন্দার কারণগুলি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করলাম। এবার ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে চটের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের এই সংকট মোকাবিলায় সরকার কী ভূমিকা নিয়েছিল আমরা এটা দেখার চেষ্টা করব।

১। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মূল পাট চাষ কেন্দ্রগুলি অধুনা বাংলাদেশের মধ্যে চলে যায়, ফলতঃ পাট চাষে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য সরকার কিছু প্রচেষ্টা চালায়। প্রথমতঃ আউশ ধান চাষের বদলে পাট চাষকে উৎসাহিত করা হয়। এটা করতে গিয়ে ধান উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিতে চাল উৎপাদন হলে সেই ক্ষেত্রে চালে ভর্তুকি দেওয়া হত। এর ফলে কাঁচা পাটের চাষ বৃদ্ধি পায়। পাট চাষের জমি ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬-এর মধ্যে বৃদ্ধি পায় পশ্চিমবঙ্গে তিনগুণ, আসামে দুই গুণ পর্যন্ত। পরবর্তী কালে সরকারি নীতি পালটে যায়, আউশ চাষকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় এবং এক ফসলি জমিতে যেখানে কেবলমাত্র আমন চাষ হয় সেখানে আমন চাষের আগে পাট চাষ শুরু করা হয়।

২। কাঁচা পাটের গুণগত মানের উন্নতি ও একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি যেমন একটি সমস্যা তেমনি সমস্যা হল মূলধনের অভাব ও যথাযথ বাজারজাতকরণ। এই সমস্যাগুলি নিরসনে সরকারি ভূমিকা কী এবং এর সার্থকতাই বা কতটুকু?

কাঁচা পাটের গুণগত মানের উন্নতি ও একর-প্রতি ফলন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গবেষণার স্তরে কিছু কাজ হলেও বাস্তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তার অভাব বিশেষভাবে দেখা যায় — এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল জুট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আই জে ডি পি) চালু হয় ১৯৭২-৭৩ সালে। কিন্তু তার লক্ষ্য যা ছিল তা পূরণ হয়নি—অবস্থা এমনই খারাপ যে পাট চাষের জন্য সারের যে মাত্রা ঠিক হয় তা আই জে ডি পি অঞ্চলগুলিতে প্রয়োগ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, পাট চাষের ক্ষেত্রে প্রান্তিক চাষীদের সংখ্যাই বেশী। স্বাভাবিকভাবে মূলধনের অভাবটিও চলে আসে। এই ক্ষেত্রে সরকারি ভূমিকা খুব বেশী দেখা যায় না। চাষীদের মোটামুটিভাবে নির্ভর করতে হয় ব্যবসায়ী বা মহাজনদের ওপর। দাদন নিয়ে অল্প দামে তাদের কাছেই মাল বেচে দিতে হয়। ফলতঃ চাষীরা আশাব্যঞ্জক দাম পায় না। মূলধন সরবরাহের যথাযথ ভূমিকা সরকার পালন না করলেও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা নেয়—জুট করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া (জে সি আই) তৈরি করার মাধ্যমে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালে। এর মাধ্যমে সরকার নির্দিষ্ট দামে বাজার থেকে পাট কিনতে থাকে। কিন্তু কর্পোরেশন কাজ করতে থাকে ভীষণ নীচু তারে—প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় ১৫ বছরের মাথায় বাজারে আসা কাঁচা পাটের মাত্র ২৪% কিনছে (১৯৮৫-৮৬)। কো-অপারেটিভ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাও জে সি আই-এর ব্যর্থতার সাথে যুক্ত হয়। মহারাষ্ট্রের তুলা চাষের ক্ষেত্রে

কিন্তু কো-অপারেটিভগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ব্যাপারে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত জে সি আই প্রায় কোনো কাজই করেনি। ১৯৯৭-৯৮ সালে জে সি আই কাঁচা পাট কেনে ৯ লক্ষ ৪২ হাজার বেল, যেখানে ১৯৮৫-৮৬-তে এর পরিমাণ ছিল ২৪ লক্ষ বেল, ১৯৮৬-৮৭-তে ২২ লক্ষ বেল। জে সি আই-এর কর্মপদ্ধতি নিয়ে বোধহয় কিছু বলা দরকার। জে সি আই পূর্ব নির্ধারিত একটি দামে পাট কেনা বেচা করে, যা উন্নত মানের পাট চাষের পরিপন্থী। কারণ সেই নির্ধারিত দামে উচ্চ মানের পাট বিক্রি করতে পাট চাষীরা বিশেষ উৎসাহিত হয় না। ফলতঃ এন জে এম সি মিলগুলি উন্নতমানের কাঁচা পাট বিশেষ পায় না।

৩। পাট শিল্পের একটি দিক যেমন পাট চাষ, তেমনি আর একটি দিক হল কারখানা। এই কারখানার প্রধান সমস্যা হল আধুনিকীকরণ। যেটুকু আধুনিকীকরণ এই শিল্পে হয়েছে, তা হয়েছে ষাটের দশকে — স্পিনিং এবং নন-স্পিনিং এর ডিপার্টমেন্টগুলিতে। অন্য ক্ষেত্রগুলিতে প্রায় হয়ই নি। আধুনিকীকরণে সরকার কিছু কিছু প্রচেষ্টা বিভিন্ন সময়ে নিয়েছে। যেমন একটা প্রচেষ্টা হল ১৯৭৬-এ আই ডি বি আই এর সফ্‌ট লোন প্রকল্প। বাস্তবে মাত্র ৬ কোটি টাকা লোনের গ্রাহক পাওয়া গিয়েছিল। কারণ, যে কোনো সহজ লোনের সঙ্গেই কিছু বিশেষ শর্ত থাকে। কিন্তু মিল মালিকেরা কোনো রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। এরপর ১৯৮৬-এর নভেম্বরে আর একটি প্রচেষ্টা নেওয়া হয়—এই সময়ে মডার্নাইজেশন ফান্ড তৈরি করা হয় প্রায় ১৫০ কোটি টাকার। এই ফান্ড থেকে ১৪টি মিলে ৫৭.২৯ কোটি টাকা লোন অনুমোদন করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিতরিত হয় মাত্র ৮.৯ কোটি টাকা। এই ফান্ডের আভ্যন্তরীণ কাঠামোটির কিছু বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। ১৫০ কোটি টাকার মধ্যে ১০০ কোটি টাকা প্ল্যান্ট ও মেশিনারী আধুনিকীকরণের জন্য; এবং সম্পূর্ণ নতুন মেশিনারী কেনার জন্য; ৩০ কোটি টাকা রাখা ছিল অপেক্ষাকৃত ভাল পরিচালিত মিলগুলির জন্য, ২০ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের দেয় টাকার জন্যে এবং মাত্র ৬% সুদে। এই প্রকল্পটির পরিচালক আই এফ সি আই-কে ভর্তুকি দেওয়ার দায়িত্ব নেয় কেন্দ্রীয় সরকার।

উপরোক্ত সরকারি প্রচেষ্টাগুলি ছাড়াও সরকার ১৯৮৭ -তে Jute Packing Material Compulsory Use in Packing Commodity Act চালু করে। এই আইন অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক চট ও চটজাত থলের ব্যবহার চালু করে—খাদ্যশস্যের ও চিনির ক্ষেত্রে ১০০%, সিমেন্ট ও সারের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭০% ও ৫০%। সিমেন্ট ও সারের শিল্পে অবশ্য এই আইন লঙ্ঘন করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সরকারি ভূমিকা এই ক্ষেত্রে দুর্বল। এছাড়াও অন্য পদক্ষেপগুলির মধ্যে আছে আমদানি শুল্ক ছাড় দেওয়া, পাটজাত পণ্যকে উৎপাদন শুল্কের বাইরে রাখা। এর বাইরে আছে সরকারি ক্রয় যার পরিমাণ মোট উৎপাদিত স্যাকের ৩০%। অবশ্য এই ক্ষেত্রে একটি প্রধান ত্রুটি হল সারা বছর ধরে অর্ডার না দিয়ে বছরে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রায় সব অর্ডার দেওয়া — যা পাটকলগুলির পক্ষে অল্প সময়ে যোগান দেওয়া অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। ■

পাট শিল্প — মূল সমস্যা ও সমাধানের অভিমুখ

এই অংশে আমরা চেষ্টা করব শিল্পটির মূল সমস্যাগুলি বেছে নিয়ে তার সম্ভাবনার অভিমুখ নির্দেশ করতে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা আলোচনাটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি—

(ক) কাঁচাপাটের চাষ ও বন্টন সংক্রান্ত, (খ) শিল্প সংক্রান্ত, (গ) শ্রমিক সংক্রান্ত।

কাঁচা পাটের চাষ ও বন্টন সংক্রান্ত

পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে যেহেতু উন্নত মানের কাঁচা পাট উৎপাদিত হয় সামান্যই, চেষ্টা করা প্রয়োজন উন্নত মানের কাঁচা পাট উৎপাদনের পরিবেশ তৈরি করা এবং ঐ পাটকে যাতে চাষীরা ন্যায্যমূল্যে বেচতে পারে তার জন্য একটি সুস্থ পরিকাঠামো তৈরির চেষ্টা করা। একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে সর্বোৎকৃষ্ট কাঁচা পাট অর্থাৎ TD1, TD2, W1 এবং W2 সমগ্র উৎপাদনের মাত্র ৩ শতাংশ। উন্নত মানের পাটজাত সামগ্রী তৈরি করতে যেহেতু প্রয়োজন উন্নত মানের পাট, ভাল পাট উৎপাদনের ওপর তাই ভীষণভাবেই জোর দিতে হবে। উন্নত মানের কাঁচা পাটের জন্য প্রয়োজন উন্নত বীজ, উন্নত চাষপদ্ধতি এবং সর্বোপরি উন্নত রেটিং, বাংলাদেশে নদীনালার বহতাকে কাজে লাগিয়ে উন্নত রেটিং-এর যে সুযোগ আছে, পশ্চিমবঙ্গে ততটা নেই। সুতরাং আনতে হবে মাইক্রো বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট, প্রয়োজনে করতে হবে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ। উন্নত রেটিং শুধুমাত্র কাঁচা পাটের মানকেই উন্নত করবে না, কমিয়ে আনবে বর্ষার ওপর চাষীদের নির্ভরশীলতা, কমিয়ে আনবে পাটচাষের সময়। চাষীরা তাড়াতাড়ি পাটচাষে নিয়োজিত টাকা ফেরত পেতে পারবে। অতএব চাষ সংক্রান্ত গবেষণার ওপর জোর দিতে হবে এবং সেই গবেষণাকে সাধারণ চাষীর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

কিন্তু এইসব উন্নত চাষ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন মূলধনের জোর। আমরা আগেই দেখেছি যে অধিকাংশ পাট চাষীই প্রান্তিক। মূলধনের জন্য ভরসা মহাজন, যার কাছে তারা নিজেদের অসময়ে পাট 'অভাবি বিক্রি' করতে বাধ্য হয়। সুতরাং চাষের প্রয়োজনীয় মূলধনের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগী না হলে বোধহয় উপায় নেই।

এবার আসা যাক কাঁচা পাট বন্টনের প্রসঙ্গে। বর্তমানে যে বাজার ব্যবস্থা আছে তাতে চাষীদের পক্ষে আশাব্যঞ্জক দাম পাওয়া বেশ মুশকিল। কেন্দ্রীয় সরকারের জুট কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া যে বছর পাট সংগ্রহ করে সে বছরও তারা মোট ফলনের দশ শতাংশ কেনে কিনা সন্দেহ। ফলে সরকার নির্ধারিত কাঁচা পাটের মূল্য পাওয়াও হয়ে পড়ে দুষ্কর। সুতরাং বাকি থাকে আড়তদার ও দালাল নিয়ন্ত্রিত মান্ডি ও খোলা বাজার।

অল্পসংখ্যক হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে পাট উৎপাদকদের কাছ থেকে সরাসরি পাট কেনার জন্য চালু সমবায় বা কো-অপারেটিভ রয়েছে, তাদের মূল সমস্যা হল মূলধনের অভাব। এছাড়া বেসরকারি মিলগুলি তাদের কাছ থেকে পাট কিনতে চায় না — তাদের একমাত্র ক্রেতা হল এন জে এম সি মিলগুলি, যারা আবার পাট কেনা বাবদ টাকা অনেক দিন ধরে বকেয়া রাখে। ফলে বেশীরভাগ সমবায়ই শেষ পর্যন্ত অনেক কম দামে মিলে পাট সরবরাহকারী পাটের দালালদের সস্তায় পাট দিতে বাধ্য হয়। তাই লোকসানের কারণে এরা ধুঁকতে থাকে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর এবং কৃষি বিপণন দপ্তর জুট উৎপাদকদের কাছ থেকে সরাসরি পাট কিনে নিয়ে উৎপাদককে সঠিক দাম পেতে সাহায্য করতে পারে জুট কর্পোরেশন অফ বেঙ্গল-এর মত একটি সংস্থা গড়ে তুলে। এর ফলে সমবায়গুলির লোকসান হবে না আর পাটচাষীরাও কিছুটা লাভের মুখ দেখবে। কয়েক হাজার পাটচাষী সমবায় সক্রিয় সরকারি সাহায্য না পেয়ে বেশ দূর্বল। এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি দশ থেকে বারোটি ব্লক পিছু মান্ডি বা হোলসেল বাজার তৈরির প্রকল্পের কথাও ভাবতে পারে। ভাবতে পারে বড় বড় গুদাম বা ভান্ডারের কথা — যাতে চাষীরা পাটের লাভজনক দাম না পাওয়া অবধি কাঁচাপাট ধরে রাখতে হবে। তবে এ প্রসঙ্গে সরকারি উদ্যোগের সাথে সাথে সমবায় আন্দোলনের কথাও ভাবা যেতে পারে। সামনে আদর্শ হিসেবে মহারাষ্ট্রের তুলাচাষীদের সমবায় আন্দোলনকে রাখা যেতে পারে। ওই আন্দোলন তুলাচাষীদের সঠিক দাম পাওয়া সুনিশ্চিত করেছে। তবে একথাও মনে রাখতে হবে মহারাষ্ট্রে তুলাচাষীরা মোটামুটিভাবে ধনী — ফলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাও অনেক বেশী। অন্যদিকে পাট চাষীরা যেহেতু প্রান্তিক, সরকারের ওপরে নিয়ন্ত্রণও তাদের সামান্যই।

শিল্প সংক্রান্ত

শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় প্রথমেই একথা বলে নেওয়া ভাল যে বি আই এফ আর-এর বিচারাধীন মিলগুলির অনেকগুলিই (১২ থেকে ১৫টি) বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

সেপ্টেম্বর ২০০০-এর হিসেব হল ১৬টি মিল-এর স্কীম কার্যকরী অবস্থায় রয়েছে (scheme under implementation) এবং ১১টি মিল স্কীম তৈরির পর্যায়ে রয়েছে (scheme under formulation / order reserved)। এই মিলগুলির মোট শ্রমিক সংখ্যা ১ লাখ ৯ হাজার ৮০০। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ৫টি এন জে এম সি মিল ধরা হয়নি। এই সমস্ত মিলগুলির কোনো নির্দিষ্ট, সুগঠিত পুনরুজ্জীবন প্রকল্প নেই। এই সব মিল কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিনের প্রচুর বকেয়া পাওনা ফেলে রেখেছে পাওনাদার, সরকার এবং শ্রমিকদের কাছে। এই সমস্ত মিল চিরতরে বন্ধ হয়ে গেলে বেকার হয়ে পড়বে এক বিশাল সংখ্যক শ্রমিক। অসংখ্য শ্রমিক পরিবারকে ঠেলে দেওয়া হবে ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত জীবনের দিকে। এই ক্ষেত্রে সরকারি তত্ত্বাবধানে শ্রমিক, পেশাদার এবং সরকার মিলে একটি যৌথ অংশগ্রহণকারী ম্যানেজমেন্টের কথা ভাবা যেতে পারে।

যে কটি মিল খোলা থাকবে, তাদের বাজারের প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকতে গেলে অবশ্যম্ভাবীভাবে চাই আধুনিকীকরণ। এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগ ও ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে মিল-মালিক ও ব্যবস্থাপকরা আধুনিকীকরণের খাতে সরকারি ঋণের খুব সামান্যই ব্যবহার করেছে। সুতরাং মিল মালিক ও কর্তৃপক্ষকে হতে হবে উদ্যোগী এবং দূরদর্শী। মিল মালিকদের প্রসঙ্গে একথা প্রাসঙ্গিক যে দীর্ঘকালীন পরিচালকগুলী অথবা স্থায়ী মালিক ছাড়া বোধহয় কেউই কারখানা আধুনিকীকরণের মতো দায়িত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিতে চাইবে না। সুতরাং লীজী প্রথা দূর করতে এবং মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা দূর করতে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। যাই হোক, আধুনিকীকরণ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র শ্রমিকদের ওপর কাজের বোঝা বাড়িয়ে এই বাজারী প্রতিযোগিতায় জেতা যাবে না।

আধুনিকতার সাথে সাথে আনতে হবে উন্নত মানের পাটজাতদ্রব্য এবং বিভিন্ন ধরণের পণ্য। বিভিন্ন ধরণের পাটজাত পণ্য উৎপাদন প্রসঙ্গে একথা আবারও বলতে হয় যে ল্যাবরেটরী গবেষণার ওপর শুধু জোর দিলে চলবে না, নতুন নতুন পণ্যের উৎপাদন খরচ প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে হবে। এর সুফল শুধু শিল্পই পাবে না—মাঠের চাষীরাও পাবে। কারণ নতুন নতুন পণ্য বাজারজাত করতে পারলে, বাড়বে কাঁচা পাটের চাহিদা, বাড়বে চাষের জমি ও চাষীদের

উদ্যম। যেমন বেড়েছে গত কুড়ি বছরে উত্তরপ্রদেশের আখ চাষ। এটা সম্ভব হয়েছে চিনি ছাড়াও গুড়, মদ ইত্যাদির ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধিতে। তেমনিভাবেই পাটশিল্পকে শুধুমাত্র গানিব্যাগ, দড়ি ইত্যাদির মতো চিরাচরিত পণ্য উৎপাদনে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কাগজ শিল্প তার কাঁচা মালের (কাঠ) অভাবে ও অত্যধিক দামের জন্য ধুঁকছে। পাটকে কাগজ শিল্পের কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহার করার একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব শ্রী পিনাকী সেনগুপ্ত (প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর, টিটাগড় পেপার মিল) বি আই এফ আর-কে দিয়েছিলেন এবং ১৯৯০-এ বি আই এফ আর এই প্রস্তাব মঞ্জুর করা সত্ত্বেও আই ডি বি আই-এর আর্থিক অসহযোগিতায় তা কার্যকরী হতে পারেনি। সরকার এই দিকটা ভেবে দেখতে পারে। এতে দুটি শিল্প একসঙ্গে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা চটশিল্পে ইতিবাচক ইঙ্গিত নিয়ে আসছে। আন্তর্জাতিকভাবেই পরিবেশগত কারণে পাটজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। পাটজাত পণ্য বায়োডিগ্রেডেবল অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ না করে প্রকৃতির সঙ্গেই বিলীন হয়ে যায়। পাটশিল্পকে এই সুযোগের সদব্যবহার করতে হবে। ২০০০ সালে চটশিল্পে ধর্মঘটের জন্য (মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত) সিনথেটিক শিল্প চটের সম্ভাব্য অভাব নিয়ে প্রচারে নামে। চাপের মুখে কেন্দ্র শেষ পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে চিনি ও খাদ্যশস্যে ১০ শতাংশ এবং সারে দু শতাংশ হারে চটের বস্তার ব্যবহার কমিয়ে দিতে নির্দেশ দেয়। এর পরই সিনথেটিক লবি এই নির্দেশকে স্থায়ী করতে এবং চটশিল্প এই নির্দেশের প্রত্যাহারের দাবি জানাতে থাকে। বস্ত্রমন্ত্রক এই সঙ্কটে খড়গপুর আই আই টি-কে এই বিষয়ে খতিয়ে দেখতে নিয়োগ করে। আই আই টি প্যাকেজিং-এর কাজে চটের বস্তার ব্যবহার বাড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সিনথেটিক বস্তার ব্যবহার ন্যূনতম প্রয়োজনভিত্তিক হওয়া উচিত। কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ, লবণ ও সিমেন্ট ছাড়া আর কোনো শিল্পে সিনথেটিক বস্তার ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে এও বলা হয়েছে যে চটের ব্যবহার বাড়বে এমন শিল্প আরও বেশী করে স্থাপনে সরকারি পরিকল্পনায় উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। পরিবেশ দূষণকারী সিনথেটিক শিল্পের ওপর পরিবেশ-কর আদায়ের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে আই আই টি-র এই রিপোর্টে। রিপোর্টের পরামর্শগুলি রূপায়িত করতে যেমন সরকারের উদ্যোগ দরকার, তেমনি ক্রমাগত সিনথেটিক লবির চাপকে প্রতিহত করতে চটশিল্পের মালিক ও ব্যবস্থাপকদের উদ্যোগী হয়ে দূরদর্শীতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা অতীতে দেখেছি যে একসময় টেরিলিন জাতীয় সিনথেটিক কীভাবে বাজারে সুতি বস্ত্রকে কোনঠাসা করে ফেলেছিল। কিন্তু এখন আবার সুতীবস্ত্র ধীরে ধীরে বাজার দখল করে ফেলছে। স্বাভাবিক রেশমের ক্ষেত্রেও একই ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিল্প মিলিয়ে ৫০ কেজি ব্যাগের যা উৎপাদন ক্ষমতা তার সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। এব্যাপারে প্রয়োজনীয় আলোচনা করে দেখতে হবে মিল-ভিত্তিক সত্যি সত্যিই ৫০ কেজির ব্যাগ উৎপাদনের ক্ষমতা ঠিক কতটা। সঠিক তথ্য না পেলে বুঝতে সুবিধে হবে কেন? সার-সিমেন্ট শিল্প অর্ডার দিলে (আইন অনুযায়ী), বছরের নির্দিষ্ট সময়ে নির্মাণ শিল্প চাইলে, বা চাষের মরশুমে, এই বস্তার চাহিদা হঠাৎ বেড়ে গেলে যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। যার ফলশ্রুতিতে আবশ্যিক জুট ব্যবহারের আইন শিথিল করার দাবী ওঠে সংশ্লিষ্ট মহলগুলিতে—কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়, অবশেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সরাসরি হস্তক্ষেপে আইন শিথিল করা হয়। আমাদের রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি শুধুমাত্র রুটিনমাফিক চিঠি দিয়েই দায় সারেন। প্রয়োজন সমস্যার মূলে গিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করার।

শ্রমিক সংক্রান্ত

আমরা আগেই দেখেছি যে চট শিল্পে শ্রমিকরাই স্বাভাবিকভাবে এই শিল্প সংকটে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্থ যে সংকট সৃষ্টিতে তার ভূমিকা প্রায় নেই। বরং তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আই, গ্র্যাচুইটির কোটি কোটি টাকা মালিকরা মেরে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের বকেয়া দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে—প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

কিছু কারখানা হয়তো চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সে কথা আগেই আলোচিত। সেক্ষেত্রে বেকার হয়ে পড়বে বিরাট সংখ্যক শ্রমিক। এছাড়া শিল্পের আধুনিকীকরণের প্রয়োজন মেনে নিলে, বোধহয় একথাও মানতে হবে যে সেক্ষেত্রেও

উদ্বৃত্ত হয়ে পড়বে আরও অনেক শ্রমিক। সব মিলিয়ে এই বিপুল শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্য সামাজিক নিরাপত্তার দাবিই বোধহয় সব থেকে যুক্তিযুক্ত— এবং তা চটশিল্পের ক্ষেত্রে সীমায়িত রাখলে চলবে না, তাকে যুক্ত করতে হবে অন্যান্য সমস্ত শিল্পের সংকটের সঙ্গে।

সমাধানের অভিমুখ আরো স্পষ্ট করতে এই রিপোর্টে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নানান প্রস্তাব, এক জায়গায় নিয়ে আসা হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই পুনরাবৃত্তি করাটাই উদ্দেশ্য—

সামগ্রিকভাবে চটশিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রস্তাব।

★ যে জুটমিলগুলিকে বি আই এফ আর ওয়াইণ্ডিং আপ (winding up) করেছে বা লিকুইডেশনের জন্য ঘোষিত হয়েছে এবং পাশাপাশি কারখানাটির বর্তমান কর্তৃপক্ষ / মালিক পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে সক্ষম হয়নি — এধরণের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় শিল্পে এক চরমতম নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সরকার, ব্যাঙ্ক, আর্থিক সংস্থা, শ্রমিক, কর্মচারি এবং অন্যান্যদের বিপুল পরিমাণ অর্থ বকেয়া পাওনা রয়ে গেছে এই মিলগুলিতে। এসব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার, শ্রমিক-কর্মচারি এবং জুট পেশাদারদের যৌথ উদ্যোগে মিলগুলির পরিচালনা অধিগ্রহণে উদ্যোগ নেওয়া যায়। তবে এই সব মিলের পরিচালনার বিষয়টি সর্বস্তরেই সদর্থক যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে করতে হবে। আমাদের হিসেব অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে ১২ থেকে ১৫টি মিলে এই ধরণের ব্যবস্থা নেওয়ার মত অবস্থা রয়েছে।

★ পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু চটকলে বকেয়া পাওনা সব মিলিয়ে কয়েকশো কোটি টাকায় পৌঁছেছে। বকেয়া দেনা পরিশোধ না হওয়ায় বেড়ে চলেছে। উক্ত মিলগুলিতে ক্রমবর্ধ মান ঋণের ফলে এক গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। কারখানার মেশিন, লুম যন্ত্রাংশ পরিবর্তন বা সারানোর কাজটি একেবারেই হচ্ছে না। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, পদ্ধতিগত আধুনিকীকরণ নিয়ে মিলগুলিতে সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং বাজারের প্রতিযোগিতার উপযোগী করে গড়ে তোলার কাজটি বহুকাল ধরেই অবহেলিত। এটা বুঝতে হবে যে, এটা ব্যক্তি মালিক তথা ভাড়াটে পরিচালকদের নিজস্ব মনমর্জি ও সিদ্ধান্তর ওপর ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সরকারকে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করতে হবে। কারখানা পরিচালনা অধিগ্রহণের মাধ্যমে জুটমিলগুলির এক ধরণের পরিচালক জমি-শেড মেশিন (স্ক্র্যাপ)-যন্ত্রাংশ অর্থাৎ স্থায়ী সম্পদ হস্তান্তর / বিক্রয়, পাচার ইত্যাদি করে চলেছে দ্রুত লাভের আশায়। এ ধরণের কেসগুলি অনুসন্ধান সাপেক্ষে সরকারকে সরাসরি অধিগ্রহণের মাধ্যমে সঠিক পুঁজি বিনিয়োগ করে জুটমিলগুলির দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের পথে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন।

★ লক্ষ্যণীয় ভাবে দেখা যাচ্ছে যে, একই জুটমিলে একই ধরণের কাজের ক্ষেত্রে নানান ধরণের মজুরী ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। মজুরী সংক্রান্ত আইন, ফ্যাক্টরি আইন, শ্রম আইন লঙ্ঘনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি নজরদারী ব্যবস্থা যা কিনা কাম্য ছিল তা অনুপস্থিত। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে সরকারি ভূমিকা এসব ক্ষেত্রে নেতিবাচক। এর ফলে শিল্পে সৃষ্টি হয়েছে চরমতম নৈরাজ্য। মনে রাখতে হবে যে অসৎ মিল পরিচালক ঠিকাদার এই শিল্পে এমনই এক অরাজক অবস্থা তৈরি করেছে যাতে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সদর্থক শিল্প পুঁজি এবং নিয়ম মেনে চলা জুট পরিচালক ও কর্তৃপক্ষ। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এই অবস্থায় তাঁরা আত্মসমর্পণ করেছেন প্রচলিত অরাজকতার কাছে। অবিলম্বে সরকারের হস্তক্ষেপ দরকার।

★ বেশ কিছুকাল ধরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে জুট ইয়ার্ন রপ্তানির দিকে ঝোঁক বেড়ে চলেছে। এতে বিদেশী ডলার উপার্জনের সুযোগ রয়েছে। ধীরে ধীরে অন্যান্য ধরণের পাটজাত দ্রব্য কম লাভজনক বা অলাভজনক অ্যাখ্যা দিয়ে উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া বা বন্ধ করে দেওয়ার একটা ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিষয়টিতে সরকারের নজর দেওয়া জরুরী। শিল্পে প্রয়োজনীয় বাজার, চাহিদা, উৎপাদন ক্ষমতা, শ্রমিকের দক্ষতা দীর্ঘকালীন ধরে অব্যবহৃত হয়ে থাকলে খুব শীঘ্রই বিশ্ব বাণিজ্যের ধাক্কায় দেশ-বিদেশের আভ্যন্তরীণ বাজারটিও হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে শিল্পটিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

★ পাটশিল্পের আভ্যন্তরীণ বাজারে সুতো-সুতুলি-পাটের দড়ির একটি সুরক্ষিত বাজার রয়েছে। বড় বড় মিলগুলির এইসব উৎপাদন বেশীরভাগ সময়েই লাভজনক হয় না। যদিও বড় মিলের মধ্যে মহাদেও, ই এম কো, নস্কর পাড়া, এমন কয়েকটি মিল আছে (প্রসঙ্গত, এই কারখানাগুলিতে স্থায়ী শ্রমিক খুবই সামান্য। অন্যদের দৈনিক ৩০ থেকে ৬০ টাকা মজুরীর বিনিময়ে কাজ করানো হয়) সেখানে পাটের দড়ি-সুতো বানান হয়। ১৯৯২-৯৩ তে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পশ্চিমবঙ্গে ২০টির মত মাঝারি ও ছোট জুটমিল তৈরি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, পাট উৎপাদন হয় পশ্চিমবঙ্গের এমন এলাকাগুলিতে একাধিক ছোট-মাঝারি জুটমিল গড়ে উঠতে পারে। এর সুবিধার একটি দিক হল যে পণ্য পরিবহন বাবদ খরচ ন্যূনতম হয়ে যায়। এককালীন পাট মজুতের প্রয়োজন না থাকায়, কম পুঁজি বিনিয়োগে কাঁচামাল / পাট পাওয়ার সুলভ সম্ভাবনা থাকায় বাজারে বস্তা বা ব্যাগের মত ছোট ছোট দ্রব্যের যে চাহিদা রয়েছে তাকে পুরণ করা যেতে পারে। সরকারকে এই ধরণের মিলগুলির উপযোগী দক্ষ শ্রমিক গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

★ পশ্চিমবঙ্গের পেপারমিল গুলির বেশীরভাগটা বন্ধ বা রুগ্ন হয়ে ধুঁকছে। এর অন্যতম কারণ কাঁচামালের অভাব। পাটকে কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার করে, পেপারমিলের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন করে একটি বাস্তব-সম্মত পরিকল্পনা শিল্প বিশেষজ্ঞ ও পেপার মিল পরিচালনায় পরিচিত পেশাদার শ্রী পিনাকি সেনগুপ্ত, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯-তে রাজ্য সরকারের কাছে দিয়েছেন। নাগরিক মঞ্চ বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প সংক্রান্ত যে স্টাডি রিপোর্ট টি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ অর্থমন্ত্রীর কাছে দিয়েছেন তাতেও আর্থিক এবং অন্যান্য বিষয়ে বিশদভাবে পরিকল্পনাটি অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছিল। সরকার উদ্যোগী হয়ে এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করে তুললে পাটের বহুমুখী ব্যবহারের ফলে পাট চাষীও পাটকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নত হবে এবং কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনার সৃষ্টি করবে। ■

পরিশিষ্ট

পাট শিল্প — আগেকার কথা

- ১৮৩০ — স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডিতে প্রথম বাষ্পচালিত তাঁতকল স্থাপন হয়।
- ১৮৫৩ — ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হওয়ায় ইউরোপের বাজারে রাশিয়ার শণের সরবরাহ বন্ধ হয়। ফলে ইউরোপের বাজারে বাংলার পাটের আমদানি বাড়তে থাকে।
- ১৮৪৮ থেকে ১৮৮৮ এই ৪০ বছরে বাংলাদেশের কাঁচা পাটের রপ্তানি ১২০০ টন থেকে বেড়ে ২,৬২,০০০ টনে পৌঁছয়।
- ১৮৩০ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত চটের পণ্য উৎপাদনে স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রেখেছিল। কিন্তু এরপর ধীরে ধীরে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা বাংলায় চটশিল্প স্থাপনে নজর দেন। এর কারণ ছিল দুটো : প্রথমত, কাঁচা পাট পাওয়ার সুবিধে। দ্বিতীয়ত, সস্তায় শ্রমিক পাওয়ার সুবিধে।
- ১৮৫৫ — হুগলী জেলার রিষড়ায় জর্জ অকল্যাণ্ড প্রথম চটকল স্থাপন করেন।
- ১৮৭০ — বাংলায় মোট ৫টা চটকল উৎপাদন শুরু করে যাতে মোট তাঁতের সংখ্যা ছিল ৯৫০০, শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৫০০০।
- ১৯০৪ — চটশিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৬ কোটি ৮ লক্ষ টাকা।
- ১৯২৪ — বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬ কোটি টাকা।
- ১৯৪৭ — রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর। পাট কেনা-বেচার সাথে বেশ কিছু দেশীয় ব্যবসায়ী চটকলের মালিক হয়ে বসলেন। বিদেশী মালিকদের হাত থেকে চটকলগুলি স্বদেশী হস্তান্তর হল।
- ১৯৫৫ — ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থা বাতিল হল। সরাসরি মিলভিত্তিক মালিকানা ব্যবস্থা চালু হল।

পাট শিল্প - পশ্চিমবঙ্গে চটকল

পরিশিষ্ট ২

চটকলের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর	পুরনো মালিক	বর্তমান মালিক	লীজ/মালিকানা	অবস্থান
১. আগরপাড়া	১৯২৭	ডি আই এব্রাহাম, এস সি ল, এম আই ওয়েসলে, জি পি গোয়েঙ্কা	গোবিন্দ সারদা	লীজ	কামারহাটি, ২৪-পরগণা (উ)
২. অম্বিকা	১৯২৭	রাধাকৃষ্ণ মোর, এম আর মোর, ধনরাজ বাগাড়িয়া, এস পি গোয়েঙ্কা	এ সি কাংকারিয়া, এইচ সি কাংকারিয়া	" "	বেলুড়মঠ, হাওড়া
৩. অ্যালায়েন্স *	১৮৯৫	ডি সি আম্বানা, বি সি জৈন, আর কে জালান	এ কে লোহিয়া	মালিকানা	ভাটপাড়া, ২৪ পরঃ (উ)
৪. অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া	১৯১৭	কে পি গোয়েঙ্কা, আর এন বাঙ্গুর, জে এম গোয়েঙ্কা; জে বি গোয়েঙ্কা	চাঁপদানি গ্রুপ ডি জে ওয়াধয়া, বি ওয়াধয়া	টেকওভার	ভাটপাড়া, ২৪ পরঃ (উ)
৫. অ্যাঙ্গাস	১৯১৮	থমাস ডাফ গ্রুপ, এম এল মেহলা	সঞ্জয় ওস্তায়াল, আর কে পোদ্দার	লীজ	ভদ্রেশ্বর, হুগলী
৬. অকল্যাণ্ড *	১৯০৮	ডি সি কাংকারিয়া, এইচ সি কাংকারিয়া, এস এন হাদা	এ কে কাংকারিয়া, এইচ সি কাংকারিয়া	মালিকানা	জগদ্দল, ২৪ পরগণা (উ)
৭. বরানগর *	১৮৭২	জার্ডিন হেন্ডারসন, মেহতা হাতবদলে বি গুপ্তা, জালান এস এল দুগার	জৈন, জালান, কমিটি, গোবিন্দ সারদা	টেকওভার	বরানগর, ২৪ পরগণা (উ)
৮. বিড়লা *	১৯১৯	এম পি বিড়লা, জি ডি কোঠারি	বিড়লা গ্রুপ	মালিকানা	বিড়লাপুর, বজবজ ২৪ পরগণা (দ)
৯. বালি *	১৯১৮	এম পি বিড়লা, আর এন বাঙ্গুর বি পি পোদ্দার	এ সি কাংকারিয়া, এইচ সি কাংকারিয়া, মোতি কেজরিওয়াল	"	বালি, হাওড়া
১০. শুরা *	—	—	বিড়লা গ্রুপ	"	নারকেল ডাঙা, কলকাত
১১. বজবজ *	—	পোদ্দার	এ কে পোদ্দার	"	বজবজ ২৪ পরগণা (দ)
১২. ক্যালকাটা *	১৯২৯	ডি পি পোদ্দার, কে পি পোদ্দার, আর কে মোর	বি কে পোদ্দার	"	নারকেল ডাঙা, কলকাতা
১৩. ক্যালিডোনিয়ন *	১৯১৫	এস কে জেটিয়া, ডি বি গোয়েঙ্কা, আর এন বাঙ্গুর	জগদীশ পোদ্দার, ওয়াই পি তাই	"	বজবজ, ২৪ পরগণা (দ)
১৪. চেভিয়েট *	—	বি ডি কানোরিয়া, হাতবদলে এন কেজরিওয়াল ও পি কে কেজরিয়াল	এইচ বি কানোরিয়া	"	বজবজ, ২৪ পরগণা (দ)
১৫. ওয়েলিংটন	১৯২১	জি জে ওয়াধয়া, জে আর সি ওয়াধয়া	বি ওয়াধয়া	"	রিষড়া, হুগলী
১৬. ডালহৌসী *	১৯০৩	প্রাণপ্রসাদ	রঘু মোদি	"	বৈদ্যবাটী, হুগলী

পাট শিল্প - এক নজরে

পরিশিষ্ট ৩

• গড় পাট চাষের জন্য জমির পরিমাণ		১,০০৭	হাজার হেক্টর
• গড় কাঁচা পাট ফলন		১০,১৩৩	হাজার বেল
• সারা ভারতে মোট চটকল		৭৩	
• বিভিন্ন রাজ্যে চটকল	পশ্চিমবঙ্গ	৫৯	
	অন্ধ্রপ্রদেশ	৪	
	বিহার	৩	
	উত্তরপ্রদেশ	৩	
	আসাম	১	
	উড়িষ্যা	১	
	মধ্যপ্রদেশ	১	
	ত্রিপুরা	১	
• চটকলে কর্মরত স্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারি		১,৯৪,১৫১	
" " অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারি (আনুমানিক)		৪১,০০০	
জানুয়ারী ২০০০			
• পাটজাত দ্রব্যের গড় বাৎসরিক উৎপাদন		১,৬২২	হাজার টন
• পাটজাত দ্রব্যের বাৎসরিক রপ্তানির পরিমাণ		১৮৯	হাজার টন
• পাটজাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদার গড় বাৎসরিক পরিমাণ		১,৪০৬	হাজার টন
• রাষ্ট্রায়ত্ত চটকল সংস্থা		৭	*
• ১০০% রপ্তানিকারি সংস্থা		৮	**
• রপ্তানিকারি সংস্থাগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতা		৫১,৬২০	টন ***
• চটশিল্পে মোট লুম বা তাঁত (জানুয়ারী ২০০০)		৪৩,৭৯০	
	হেসিয়ান	২৬,০৬২	
	স্যাকিং	১৫,৪২৬	
	কার্পেট ব্যাকিং	১,৫৩৫	
	অন্যান্য	৭৬৭	
• চটশিল্পে স্পিন্ডিল সংখ্যা		৬,৪৪,৩৮৮	
	সরু সূতা	৫,৫৮,৪২০	
	মোটা সূতা	৮৫,৯৬৮	
• ১০০% রপ্তানিকারী মিলে লুম বা তাঁত (যন্ত্রচালিত)		১০২	
• ঐ স্পিন্ডিল সংখ্যা		৯,৩৭৬	
	সরু সূতা	৭,৭৩৬	
	মোটা সূতা	১৬৪০	
• স্পিন্ডিল-এর সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করা গেলে মোট উৎপাদন (বছরে কাজের দিন ৩৩০ ধরে) [১০০% রপ্তানি করা মিল ছাড়া]		১৯০১	হাজার টন

* আলেকজান্দ্রা, খড়দহ, কিনিসন, ন্যাশনাল, আর বি এইচ এম, ইউনিয়ন, বি জে ই এল (এন জে এম সি সাবসিডিয়ারি)

** চাঁপদানি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, নদীয়া মিলস কোম্পানি লিঃ, লিবরা এক্সপোর্টার লিঃ, মোহন জুট ব্যাগ, কাজারিয়া ইয়ার্নস অ্যাণ্ড টোয়াইনস্ লিঃ, চেভিয়ট কোম্পানি লিঃ, বজবজ কোম্পানি লিঃ, ডেলটা ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ

*** এইসব সংস্থায় সূক্ষ্ম পাটের তন্তু ছাড়াও ব্লিচ বা ডাই করা আধুনিক পাটের কাপড়, ব্যাগ, ফেব্রিক তৈরি হয়।

পাট শিল্পে সমস্যা — সমাধানের দিশা

পরিশিষ্ট ৪

মনে রাখতে হবে, চটশিল্প বেশীর ভাগটাই প্যাকেজিং কেন্দ্রীক চাহিদা নির্ভর। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে চটশিল্প প্রধানত তিন ধরণের কারণে ভয়ঙ্করভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে।

- দেশভাগ জনিত কারণে, ভারতের আন্তর্জাতিক জুট দ্রব্যের বাজারে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দী হিসেবে উত্থান।
- প্যাকেজিং দ্রব্যের ক্ষেত্রে সিনথেটিক প্যাকেজিং-এর আবির্ভাব (প্লাস্টিক/পলিমার) দামে সস্তা এবং ওজনে হাল্কা হওয়ার জন্য দ্রুত চাহিদা বৃদ্ধি। প্রাকৃতিক তন্তু কোণঠাসা কৃত্রিম তন্তুর কাছে।
- খাদ্যশস্যপন্য পরিবহণের ক্ষেত্রে জুট বস্তা বদলে ধাতব আধারের (Metal container) ব্যবহার।

এই তিনটি বিষয়ে চটশিল্পে যে আক্রমণ এসেছে তাকে রুখতে প্রধানত যে তিনটি পদক্ষেপ জরুরী—

- উৎপাদনের খরচ কমানো
- উৎপাদনের গুণমান বৃদ্ধি
- পরিবেশ সহায়ক প্রাকৃতিক এই তন্তুর ব্যবহার বাড়ানো

এর জন্য প্রয়োজনীয় লক্ষ্যে পৌঁছুতে প্রয়োজন ঃ

— শিল্প প্রয়োজন ভাল মানের কাঁচা পাটের যোগান
— চটকলগুলির আধুনিকীকরণ, অন্ততঃ ধাপে ধাপে হলেও
— উৎপাদনের পদ্ধতিগত সংস্কার এবং উৎপাদনের বৈচিত্রীকরণ

চটশিল্প ও পাট চাষের পুনরুজ্জীবনের জন্য কয়েকটি মতামত—

১। কারখানা তুলে দেওয়ার (লিকুইডেশন) ক্ষেত্রগুলিতে মালিক যদি দীর্ঘকালীন ভাবে অনুৎসাহিত হয়ে পড়েন কিংবা কোনো রকম পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা না থাকে সে সব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মধ্যে থেকে পরিচালনায় উদ্যোগী হতে উৎসাহিত করতে হবে এবং পাশাপাশি সরকারকে শিল্প পেশাদারদের সহযোগিতা নিয়ে শ্রমিকদের পরিচালনায় সাহায্য করতে হবে।

২। যে সব ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মাত্রায় দেনার দায়ে মিলটির পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয় এমন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের পুনর্বাসন বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারকে সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং রাজ্যে পরিকল্পনায় ও বাজেটে এর জন্য আর্থিক সংস্থান রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারও এ বিষয়ে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

৩। পাট চাষ এবং চটশিল্পের গুণগত, পদ্ধতিগত মানের উন্নতির জন্য প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ, সরকারি সহায়তা দিতে হবে।

৪। শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষাকে সুরক্ষিত করতে হবে। কারখানায় সমকাজে সমমজুরী—সরকারি এই নীতি এবং কানুনটিকে কার্যকর করতে হবে। বিশেষ করে চটশিল্পে রুগ্ন বলে ঘোষিত মিলগুলিতে পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের জন্যে সচেষ্ট হতে হবে।

৫। পাটের সুতো (ইয়ার্ন) রপ্তানির বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, এই ক্ষেত্রে অল্প কিছুদিন সংশ্লিষ্ট সংস্থাটি লাভের মুখ দেখলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দীর্ঘকালীন ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

৬। পাট উৎপাদন হয় এমন এলাকাগুলির ১০ থেকে ১২টি ব্লক নিয়ে একটি করে পাইকারী বাজার গড়ে তুলতে হবে।

৭। পাটের সুতো তথা সুতুলি এবং পাটজাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদার কথা ভেবে পাট উৎপাদন এলাকাগুলিতে ছোট, মাঝারি মিল স্থাপনের সচেষ্ট হতে হবে ■

নাগরিক মঞ্চের প্রকাশনা ঃ

১.	কামানী টিউবের ইতিকথা ; ডিসেম্বর '৮৯	২.৫০
২.	পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক সমবায় ঃ একটি সমীক্ষা ; অগাস্ট '৯০	২.৫০
৩.	Against the Wall ; মে '৯১	৪০.০০
৪.	বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ; অগাস্ট '৯১	১.৫০
৫.	পশ্চিমবঙ্গের আক্রান্ত শ্রমিক ; মে '৯২	৩০.০০
৬.	পশ্চিমবঙ্গের ই এস আই ঃ শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা (?) (হিন্দী) ; অগাস্ট '৯২	৩.০০
৭.	Industrial Reconstruction Bank of India; এপ্রিল '৯৩	৭.০০
৮.	পশ্চিমবঙ্গের আক্রান্ত শ্রমিক ১৯৯৩ ; মে '৯৩	১৩.০০
৯.	শ্রমমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা ; জুলাই '৯৩	১.০০
১০.	চটশিল্প ; ডিসেম্বর '৯৩	২.০০
১১.	চটশিল্প (হিন্দী) ; জানুয়ারী '৯৪	২.০০
১২.	ইস্কো ; জানুয়ারী '৯৪	৩.০০
১৩.	Letter to a Chief Minister ; ডিসেম্বর '৯৪	৫.০০
১৪.	পত্রসংকলন ; মে '৯৫	৫.০০
১৫.	অনুসন্ধান ; জুন '৯৫	১০.০০
১৬.	পাটশিল্পে হচ্ছেটা কি ? নভেম্বর '৯৫	৮.০০
১৭.	পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন—এ পথে লাভ কার ? জানুয়ারী '৯৬	২০.০০
১৮.	বিপন্ন পরিবেশ ১৯৯৭ ; জানুয়ারী '৯৭	২০.০০
১৯.	উন্নতির সন্ধানে ঃ একটি তথ্যপঞ্জী ; জানুয়ারী '৯৭	৩৫.০০
২০.	সি ই এস সি ঃ লুণ্ঠনের এক অকথিত কাহিনী ; জানুয়ারী '৯৮	৭.০০
২১	প্রসঙ্গ শিল্পের সংকট ; সেপ্টেম্বর '৯৮	১৫.০০
২২.	Plight of Industries ; সেপ্টেম্বর '৯৮	৫০.০০
২৩.	Eastern Coalfields Limited ; নভেম্বর '৯৮	১০.০০
২৪.	বিশ্বায়নের গোলকধাঁধায় ; জানুয়ারী '৯৯	১০.০০
২৫.	শ্রম বিষয়ক শ্বেতপত্র, পশ্চিমবঙ্গ ; এপ্রিল '৯৯	৩.০০
২৬.	জীবনের প্রয়োজনে জীবিকার জন্যে ; সেপ্টেম্বর '৯৯	১৫.০০
২৭.	বিপন্ন পরিবেশ ২০০০ ; জানুয়ারী ২০০০	৬০.০০
২৮.	পাটশিল্প — ২০০১; ফেব্রুয়ারী ২০০১	২৫.০০

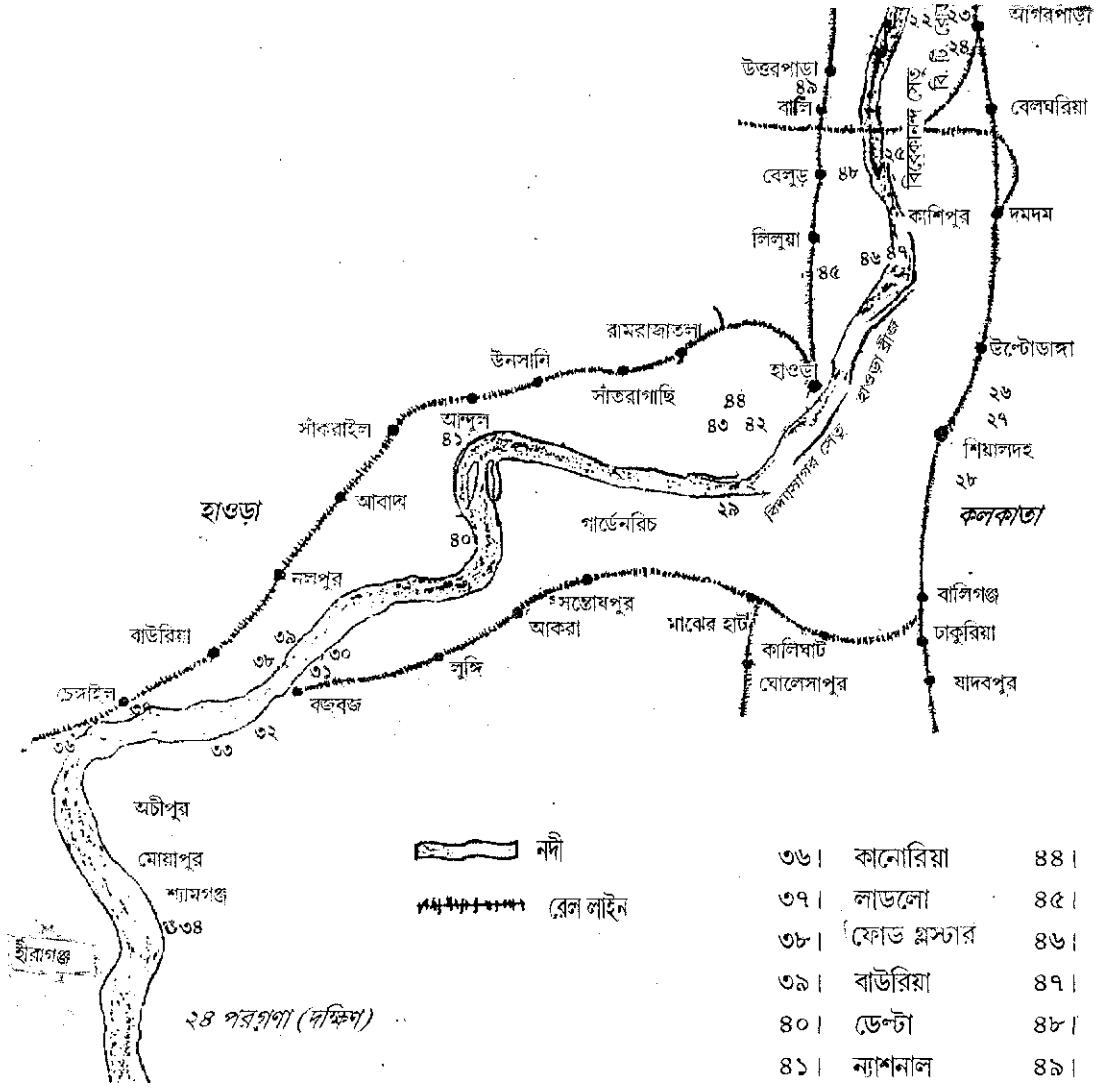

১৮। [illegible]
১৯। কিনিসন
২০। টিটাগড়
২১। খড়দা
২২। প্রবর্তক
২৩। কামারহাটি
২৪। আগরপাড়া
২৫। বরানগর
২৬। শুড়া
২৭। ক্যালকাটা
২৮। ইউনিয়ন
২৯। হুগলি
৩০। চেভিয়েট
৩১। ক্যালেডোনিয়ান
৩২। বজবজ
৩৩। নিউ সেন্ট্রাল
৩৪। বিড়লা
৩৫। প্রেমচাঁদ

৩৬। কানোরিয়া
৩৭। লাডলো
৩৮। ফোর্ড গ্লস্টার
৩৯। বাউরিয়া
৪০। ডেল্টা
৪১। ন্যাশনাল
৪২। ভারত
৪৩। ফোর্ট উইলিয়াম
৪৪। হাওড়া
৪৫। তিরুপতি
৪৬। শ্রী হনুমান
৪৭। শ্রী অম্বিকা
৪৮। মহাদেও
৪৯। বালি
৫০। হেস্টিংস
৫১। চাঁপদানি
৫২। ইন্ডিয়া
৫৩। ডালহৌসী
৫৪। নর্থ ব্রুক
৫৫। অ্যাঙ্গাস
৫৬। শ্যামনগর
৫৭। ভিক্টোরিয়া
৫৮। গোন্দলপাড়া
৫৯। গ্যাঞ্জেস